দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে
সংশোধিত নাগরিক
আইনের প্রাসঙ্গিকতা
— পৃঃ ১২

করোনাকালে 'বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা'র
উপলব্ধি করেছে ভারতবাসী
— পৃঃ ২২

৭২ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ১৫ জুন, ২০২০।। ৩২ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৭।। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

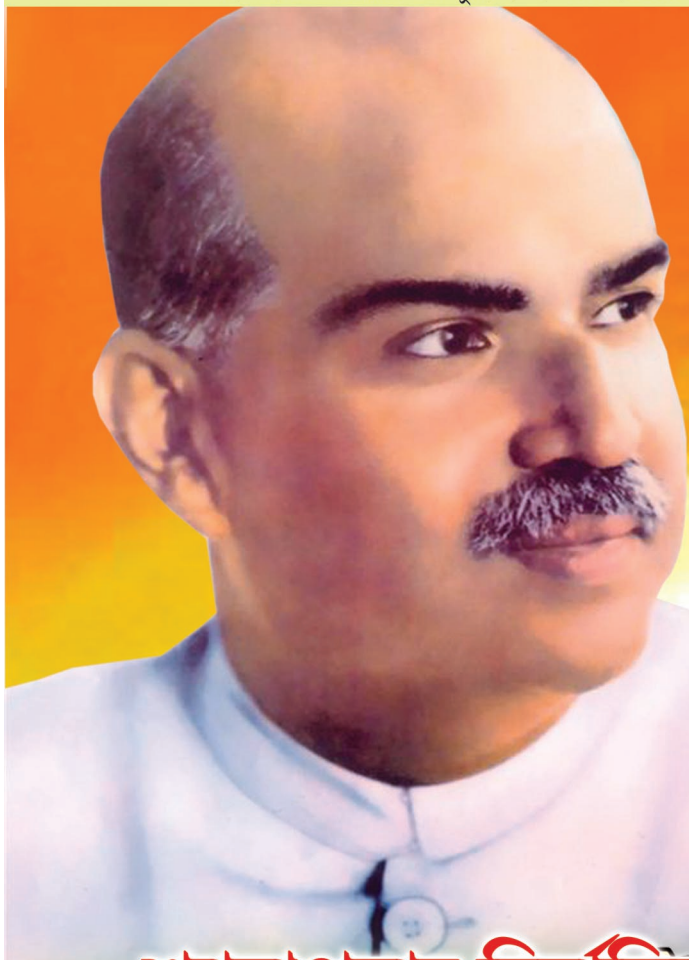

শ্যামাপ্রসাদ নির্যাতিত হিন্দুর জন্য পশ্চিমবঙ্গ আদায় করে দিয়ে গিয়েছেন

পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে!

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

करोड़ों देशवासियों का भरोसेमन्द हर्बल टूथपेस्ट

दन्त कान्ति

दन्त कान्ति के लाभ

✓ लौंग, बबूल, नीम, अकरकरा, तोमर, बकुल आदि बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दन्त कान्ति, ताकि आपके दाँतों को मिले लंबी उम्र व असरदार प्राकृतिक सुरक्षा।

✓ पायरिया, मसूड़ों की सूजन, दर्द व खून आना, सेंसिटिविटी, दुर्गन्ध एवं दाँतों के पीलेपन आदि को दूर करे।

✓ कीटाणुओं से लम्बे समय तक बचाकर दे दाँतों को प्राकृतिक सुरक्षा कवच।

पूरी दुनिया अब नैचुरल प्रोडक्ट्स को अपना रही है
आप भी पतंजलि के नैचुरल प्रोडक्ट्स अपनाइए और प्रकृति का आशीर्वाद पाइए

आवाहन– राष्ट्र के जागरुक व्यापारियों व ग्राहकों से हम विनम्र आवाहन करते हैं कि करोड़ों देश भक्त भारतीयों की तरह, आप भी पतंजलि के उत्पादों को अपनी दुकानों व दिलों में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जन–जन तक पहुँचाएं और देश की सेवा व समृद्धि में योगदान दें। जिससे महात्मा गाँधी, भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल आदि सभी महापुरुषों के स्वदेशी अपनाने के सपने को मिलकर साकार कर सकें।

पढ़ेगा हर बच्चा
बनेगा स्वस्थ और सच्चा
दन्त कान्ति का पूरा प्रॉफिट एजुकेशनल चैरिटी के लिए समर्पित है

पतंजलि आयुर्वेद के लगभग 500 उत्पाद है, ये शुद्ध खाद्य उत्पाद व हर्बल सौन्दर्य उत्पाद हमारे पतंजलि स्टोर्स के साथ ओपन मार्केट की दुकानों पर भी उपलब्ध है।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৫ জুন - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

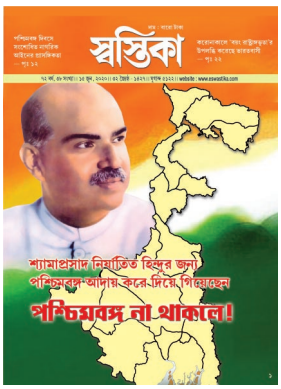

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৪

স্বখাতসলিলে ডুবছেন মমতা ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ৫

পশ্চিমবঙ্গ কেন চাই ▯ বিনয়ভূষণ দাশ ▯ ৮

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রাসঙ্গিকতা ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১২

পশ্চিমবঙ্গের জন্ম : বাঙ্গালি শুধু আত্মবিস্মৃত নয়, ইতিহাস চর্চায় উদাসীনও বটে ▯ প্রবীর ভট্টাচার্য্য ▯ ১৪

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য না বুঝলে ক্ষমতায় এলেও পশ্চিমবঙ্গের বিলুপ্তি রোধ করা যাবে না ▯ মোহিত রায় ▯ ১৭

পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে ▯ স্মৃতিলেখা চক্রবর্তী ▯ ১৯

করোনাকালে 'বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা'র উপলব্ধি করেছেন ভারতবাসী ▯ ড. মনমোহন বৈদ্য ▯ ২২

আত্মনির্ভর প্রগতিসম্পন্ন ভারত নির্মাণে জিডিপি-র কুড়ি শতাংশ ▯ শেখর সেনগুপ্ত ▯ ২৬

কোভিড মহামারী দীর্ঘস্থায়ী হোক বা না হোক দ্বিতীয় মোদী সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি রূপায়ণে অগ্রসরমান ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৮

বাংলাদেশের হিন্দুরা জন্মথেকেই জ্বলছে ▯ শিতাংশু গুহ ▯ ৩০

অথ পাশবালিশ কথা ▯ বিশ্বপ্রিয় দাস ▯ ৩২

চিঠিপত্র : ৩৩

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মৌলবাদ রোধ করিতে হইবে

পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্মের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রহিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে সময়ের দাবি মানিয়া লইয়াই অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের এই পশ্চিম অংশটি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পূর্ব অংশটি আলি জিন্নাহ ও তাঁহার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ ভারত ভূখণ্ড হইতে ছিনাইয়া লইয়াছে। অবশ্য ইতিহাসের কী পরিহাস! সেইদিন নৃশংসতার মাধ্যমে দখল করা পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানও শেষ পর্যন্ত নিজেদের দখলে রাখিতে পারে নাই। সত্তরের দশকে সেই অংশটি পাকিস্তানের বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্মের পিছনে রহিয়াছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতা। সেই যুগসন্ধিক্ষণে শ্যামাপ্রসাদ সঙ্গে পাইয়াছিলেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার ও রমেশচন্দ্র মজুমদার, বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা, রাজনীতিক সুচেতা কৃপালনীর মতো ব্যক্তিত্বকে। ইহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং আন্দোলনের ফলে সেইদিন হিন্দু বাঙ্গালির জীবন এবং সম্মান রক্ষা পাইয়াছিল। বিশাল এই বিশ্বে হিন্দু বাঙ্গালি তাহার নিজস্ব একটি আবাসভূমির সন্ধান পাইয়াছিল। শ্যামাপ্রসাদ সেইদিন কতখানি দূরদর্শিতার প্রমাণ দিয়াছিলেন তাহা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেই বোঝা যায়। দেশভাগের সময় হইতেই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হইতে বর্তমান বাংলাদেশ— ওই পূর্ব ভূখণ্ডে হিন্দু বাঙ্গালিকে নিরন্তর অত্যাচার এবং লাঞ্ছনার শিকার হইতে হইতেছে। ওই ভূখণ্ডে হিংসা ও অত্যাচারের শিকার হইয়া হিন্দু বাঙ্গালি ক্রমশ এক বিলীয়মান গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে। দেশভাগ পর্বের সময়ই শ্যামাপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন, অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটিকে যদি জিন্নাহ ও মুসলিম লিগের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করা না যায়, তাহা হইলে হিন্দু বাঙ্গালির জীবন এবং সম্মান বিপন্ন হইবে। জিন্নাহর গ্রাস হইতে পশ্চিমবঙ্গ ছিনাইয়া আনা খুব সহজ কাজ ছিল না। কারণ, জিন্নাহ অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' তিনি চান নাই। শ্যামাপ্রসাদ সেই অসাধ্য কর্মটিই সম্পাদন করিয়াছিলেন। জিন্নাহ ভারত ভাগ করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ জিন্নাহর স্বপ্নের পাকিস্তান ভাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছেন। ১৯৪৬ সালের আগস্টে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে মুসলিম লিগের কলকাতায় আবাধে হিন্দু ও শিখ নিধন এবং ওই বৎসরই অক্টোবরে নোয়াখালিতে মুসলিম লিগ কর্তৃক অবাধে হিন্দু নিধন—এই দুইটি ঘটনাই শ্যামাপ্রসাদকে তৎপর করিয়াছিল পশ্চিমবঙ্গ আদায়ের আন্দোলনে। হিন্দু বাঙ্গালি তাহার রক্তের বিনিময়ে এই পশ্চিমবঙ্গ আদায় করিয়াছে। দুর্ভাগ্য এই যে, সেই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসটিকেই সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা চালিয়াছে এতদিন যাবৎ।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন অবিভক্ত বঙ্গে প্রাদেশিক আইন সভায় ভোটাধিক্যে গৃহীত এক প্রস্তাবের মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটির জন্ম। সেই বিচারে ২০ জুন তারিখটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে গণ্য করা হউক—ইহাই আমাদের দাবি। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে—যে মুসলমান মৌলবাদের কবল হইতে শ্যামাপ্রসাদ পশ্চিমবঙ্গকে ছিনাইয়া আনিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে সেই মুসলমান মৌলবাদের পদধ্বনি আবার শুনা যাইতেছে। অতএব, পশ্চিমবঙ্গ দিবসে আমাদের শপথ হউক—এই রাজ্যে মুসলমান মৌলবাদের আগ্রাসন আমরা রোধ করিব, পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ হইতে আমরা দিব না।

সুভাষিতম্

অনাদরো বিলম্বশ্চ বৈ মুখ্যম নিষ্ঠুর বচনম্।

পশ্চতপশ্চ পঞ্চাপি দানস্য দূষণানি চ।।

অপমান করে দান করা, দেরি করে দান করা, মুখ ফিরিয়ে দান করা, কর্কশবাক্যে দান করা এবং দানের পর পশ্চাত্তাপ করা—এই পাঁচটি ক্রিয়া দানকে দুষিত করে।

স্বখাতসলিলে ডুবছেন মমতা

সাধন কুমার পাল

প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা গ্রহণ করার পর ২৯ মে শীর্ষ আদালতে শুনানি হয়। সব পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত তার অন্তর্বর্তী রায়ে বলে—

১. বিভিন্ন রাজ্য সরকার যখন ট্রেনের জন্য আবেদন করবে, রেলওয়েকে তখনই ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাসে কিংবা ট্রেনে প্রবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে ভাড়া বাবদ এক টাকাও নেওয়া যাবে না। রেল বা বাসের ভাড়া রাজ্য সরকার দেবে।

২. আটকে পড়া প্রবাসী শ্রমিকদের খাবার ও জলের বন্দোবস্ত করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকেই। কোথায় সেই ব্যবস্থা হচ্ছে তা প্রকাশ্যে জানাতে হবে।

৩. ট্রেন যাত্রার সময় যেখান থেকে ট্রেন ছাড়ছে সেই রাজ্যকে খাবার ও জল সরবরাহ করতে হবে। রেলকেও জল ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। বাস যাত্রার সময়ও খাবার ও জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৪. রাজ্য সরকারগুলো প্রবাসী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণের প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে। রেজিস্ট্রেশনের পর যাতে তাঁরা দ্রুত বাস বা ট্রেনে উঠে পড়তে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা যাত্রা করছেন, তাঁদের সম্পূর্ণ তথ্য থাকতে হবে কর্তৃপক্ষের কাছে।

৫. যে সমস্ত প্রবাসী শ্রমিক হেঁটে বাড়ি ফেরার চেষ্টা করছেন, তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে এবং তাঁদের খাবার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই রায়ের পর শ্রমিক এক্সপ্রেসের নামে ভারতীয় রেলপথ 'করোনা এক্সপ্রেস' চালাচ্ছে এমনটাই বলে গত ২৯ মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ভাবে আক্রমণ শানালেন। প্রথমে কেন্দ্র সরকার রাজ্যের অনুমতিক্রমেই প্রবাসী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর ব্যবস্থা চালু করেছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কিছু মুখ্যমন্ত্রী সমস্যাকে জিইয়ে রেখে প্রবাসী শ্রমিকদের মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতির ধারায় বিরতি টানতে কেন্দ্র নতুন নিয়ম চালু করে জানায় এবার থেকে রাজ্যের অনুমতি ছাড়াই রেল প্রবাসী শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে পৌঁছে দেবে। কেন্দ্র ও সেই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে লড়াইয়ে পেরে না উঠে কেন্দ্র সরকারের বিরোধিতার নামে এবার সরাসরি প্রবাসী শ্রমিকদের সামাজিক বিদ্রোহের মুখে ফেলার প্রয়াস করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 'করোনা এক্সপ্রেসের' যাত্রীদের নিয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে। আসলে প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো পরিকল্পনাই করেননি। রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইট বলছে, ১ মে রাজ্যে সরকারি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের সংখ্যা ছিল ৫৮২ এবং ১ জুনেও সেই সংখ্যা ৫৮২-তেই দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ রাজ্যে ফিরে আসা হাজার হাজার প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো বাড়তি ব্যবস্থা করেনি। ফলে প্রবাসীরা আসছেন কোনোরকম পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়াই গ্রামে ফিরেই বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য দীর্ঘদিন পরে ঘরে ফিরে আসা নিজের রাজ্যের প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতি একটা সরকার এতটা অমানবিক হয়ে উঠতে পারে এটা ভাবাই যায় না।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থানকে সমর্থন করতে একদল মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, লকডাউনের শুরুতেই কেন শ্রমিকদের ফেরানো হলো না? সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই যে এই ধরনের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লকডাউনের শুরুতে দেশে করোনা

পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো উপায়ও হয়তো আর অবশিষ্ট নেই মমতার ঝুলিতে। সবমিলে বলা যায়, স্বখাতসলিলে ডুবছেন মমতা।

চিকিৎসার কোনো রকম পরিকাঠামো ছিল না। পর্যাপ্ত সংখ্যক পিপিই কিট, সেনিটাইজার, ভেন্টিলেটর, কোয়ারেন্টাইন সেন্টার ছিল না। মানুষ সচেতন ছিল না করোনা সংক্রমণ সম্পর্কে। এই পরিস্থিতিতে কোনো ভাবেই করোনার বিরুদ্ধে দেশ লড়তে পারতো না। দীর্ঘ লকডাউনে দেশজুড়ে সেই পরিকাঠামো অনেকটাই গড়ে উঠলেও পশ্চিমবঙ্গে তেমন কোনো প্রস্তুতি দেখা যায়নি। এই পরিস্থিতিতে সংক্রমণ ছড়ালেও এর বিরুদ্ধে লড়ার করার পরিকাঠামোগত দক্ষতা দেশে তৈরি হয়েছে। নিজেদের অক্ষমতা ঢাকতেই যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরনের অমানবিক অবস্থান এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

করোনা মোকাবিলায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও মুসলমান তোষণ নিয়ে মমতা সরকারের ক্রিয়াশীলতায় কোনো ঘাটতি নেই। দিল্লির মরকজ ফেরত করোনা জেহাদি ভিসা আইন লঙ্ঘনকারী যে সমস্ত বিদেশি তবলিগির নামে লুকআউট নোটিশ দেওয়া হয়েছিল তাদের একটা অংশ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। এই মামলায় তদন্তে মমতা সরকার কেন্দ্রকে কোনো রকম ভাবেই কোনো সহযোগিতা করেনি। ১ জুন ইকোনোমিক টাইমসের রিপোর্ট বলছে দিল্লির মরকজ ফেরত ১৯ জন বাংলাদেশি তবলিগি জামাতি কলকাতার নিউটাউনে মদিনাত-উল-উজ্জাই কোয়ারেন্টিন সেন্টার থেকে বাসে করে সরাসরি হরিদাসপুর চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করছিল। কিন্তু তাদের নামে লুকআউট নোটিশ থাকায় বিএসফের হাতে ধরা পড়ে যায়। তদন্ত হলে ধরা পড়বে যে, কাদের সহায়তায় এই করোনা জেহাদিরা পালানোর সুযোগ পেয়েছিল। তবে সাধারণ বোধ বলছে ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের কৃপাদৃষ্টি ছাড়া এই বাংলাদেশিরা কখনোই এভাবে পালানোর সাহস করতো না।

কথায় বলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা। করোনা বিপর্যয় সামলাতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রেশন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাগুলিকে ঘূর্ণিঝড় আমফান লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। ঝড়ে বিধ্বস্ত গ্রামীণ এলাকাগুলির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু ঝড় বয়ে যাওয়ার ৭ দিন পরেও খোদ কলকাতা শহরের অনেক জায়গাতেই জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, গাছ উপড়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে আছে। ঝড় আছড়ে পড়ার সাতদিন আগে থেকেই পূর্বাভাষ ছিল। বিপর্যয় পূর্ব, বিপর্যয়কালীন এবং বিপর্যয়োত্তর ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া গেছে। কিন্তু বিপর্যয়োত্তর পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে রাজ্য প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শোনানো ছাড়া এই বিপর্যয় সামলানোর জন্য কার্যত কোনো পরিকল্পনাই করেনি। ফলে রাস্তায় বের হলেই ক্ষমতাসীন দলের নেতামন্ত্রীরা বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। চারদিকে হাহাকার। ঝড়ের পরপরই ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিতে গিয়ে কার্যত বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপদের সময় রাজনীতি ঊর্ধ্বে উঠে পাশে দাঁড়ানোর যে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাতে সাড়া দিয়ে আবেদনের ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে এসে হেলিকপ্টারে করে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা দেখে এক হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ, সেই সঙ্গে সবরকম ভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে গেলেন।

ভাবা গিয়েছিল, সাধারণ মানুষের চরম দুঃখদুর্দশা দেখে হয়তো মুখ্যমন্ত্রী ও তার দলের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। কারণ করোনা বিপর্যয়ের সময় আমরা দেখেছি বিজেপির এমপিদের ত্রাণ বিতরণ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে এবং তারা যাতে কোনো ভাবেই মানুষকে সহায়তা করতে না পারে। সেজন্য প্রথম দিকে তাদের কোয়ারেন্টাইনের নামে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে এবং চোদ্দদিন পরেও কোনোরকম কারণ না দেখিয়ে পুলিশ দিয়ে বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে এমপিরা কোনোরকম জনসংযোগ করতে না পারেন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে অনাহারে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে তৃণমূলের লোকেদের দ্বারা হেনস্থা এমনকী মিথ্যে মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা ত্রাণ দিতে গেলে পুলিশ অনুমতি পত্র চাইছে। লকডাউন ভাঙার দায়ে বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে মামলা করে দিচ্ছে। অনেক জায়গাতেই তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্থ পথ চলতি পরিযায়ী শ্রমিকদের খাবার দিতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। ভারতবর্ষে রাজনীতির এমন অমানবিক মুখ কখনো দেখা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী রাজ্য ছাড়ার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই মুখ্যমন্ত্রী স্বমহিমায় প্রত্যাবর্তন করে আবার দুর্গত এলাকায় প্রশাসনিক বৈঠকের নামে লাইভ টিভি শো-তে প্রশাসনের কর্তাদের ধমকানো, হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করলেন। যখন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশাসনিক নাটক করছেন সে সময় একই সঙ্গে পুলিশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের গাড়ি আটকে দিয়েছেন। আমফান বিধ্বস্ত এলাকায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে কলকাতা থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যাওয়ার পথে পাটুলিতে দিলীপ ঘোষের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন জমায়েত হয়ে পাথর ছুঁড়েছে। পর পর দুদিন একই ঘটনা ঘটেছে। সাংবিধানিক ও মানবিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বিপদের সময় তার নির্বাচন ক্ষেত্রের মানুষের পাশেও দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিপদের সময় মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেওয়া হচ্ছে না কেন? বিপদের সময় স্বাভাবিক নিয়মেই মানুষ দলমত ধর্ম বর্ণ ভুলে গিয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। মানবিক সংবেদনার জন্যই একজন মানুষ মুহূর্তের জন্য হলেও সব পরিচয় ভুলে গিয়ে অন্যের বিপদে ছুটে আসে। গত ২৬ মে জি ২৪ ঘণ্টার সংবাদ প্রতিবেদন বলছে, নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের আমদাবাদে ১৬১ নম্বর বুথে আমফান ঝড় বিধ্বস্তদের মধ্যে ত্রাণ বণ্টন করেছিলেন বিজেপি কর্মীরা। পরের দিন সকালবেলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে সবাইকে বিজেপির কাছ থেকে ত্রাণ নেওয়ার জন্য এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেয়। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এরকম ঘটনা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই ঘটে চলেছে। ইতিহাস ও ধারাবাহিক ঘটনাবলি বলছে, মমতা ব্যানার্জির অভিধানে রাজনৈতিক স্বার্থবর্জিত স্বাভাবিক মানবিক সংবেদনা বলে কিছু নেই।

গত বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে মে মাসে সাইক্লোন ফনি এ রাজ্যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। কেন্দ্রের তরফে পশ্চিমবঙ্গের

ফেনি দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টেলিফোনে অনেকবার চেষ্টা করেছেন মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী কোনোরকম সাড়া দেননি। আবার প্রধানমন্ত্রীকে পাল্টা ফোনও করেননি। কেন্দ্রের তরফে ফেনি দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য এই তৎপরতার জবাবে সে সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, তিনি কেন্দ্রের দেওয়া ভিক্ষে নেবেন না। তাছাড়া তিনি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে গণ্যও করেননি। সে সময় লোকসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভোটের অঙ্কে মেলানোর জন্যই মমতা ব্যানার্জি দুর্গত মানুষদের তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। এখানেই শেষ নয়, সেদিন মমতা ব্যানার্জি সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর তিনি নতুন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। কথায় কথায় সংবিধানের দোহাই দেওয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বঘোষিত রক্ষক একজন মুখ্যমন্ত্রী একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে সেদিন যে ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন এককথায় তা নজিরবিহীন। এই ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, নিজের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে মমতা ব্যানার্জি ফনি দুর্গতদের কেন্দ্রের সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছিলেন।

সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৯০ সালে। তখন তিনি বিরোধী নেত্রী। রাজ্যে ক্ষমতায় বামফ্রন্ট এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ। ভয়ংকর আয়লা ঝড় বয়ে গিয়েছিল রাজ্যের উপর দিয়ে। তৃণমূল নেত্রী কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে আয়লার সহায়তা বাবদ পশ্চিমবঙ্গে একটিও পয়সাও না আসে। কারণ হিসেবে সে সময় তিনি বলছিলেন ত্রাণের জন্য টাকা এলে সিপিএম লুটেপুটে খেয়ে নেবে। সে সময় তৃণমূল নেত্রীর বাম বিরোধিতা সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরোধিতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

লকডাউন ঘোষিত হওয়ার পর অনেক মানুষ কাজ হারিয়েছেন। ফলে দেশ জুড়ে এক অনাহারের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই অবস্থা মাথায় রেখে কেন্দ্র সরকার থেকে সমস্ত রেশন কার্ডধারীকে মাথাপিছু পাঁচ কেজি চাল ও এক কেজি ডাল দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কেন্দ্রের চাল মানুষের কাছে পৌঁছালে যদি মানুষ বিজেপিমুখী হয়ে যায় সেই ভয়েই হয়তো সেই চাল রেশন থেকে বিতরণ করতে গড়িমসি করছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু এ ব্যাপারে যখন চারদিক থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠতে শুরু করল তার পর এক মাস পর অর্থাৎ মে মাস থেকে সেই চাল বিতরণ শুরু হলো। কিন্তু এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত দেশের সমস্ত রাজ্য পেলেও কেন্দ্রের দেওয়া ডালের মুখ দেখতে পায়নি পশ্চিমবঙ্গবাসী।

চাষিদের ন্যূনতম আয় সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন ৮.৭ কোটি কৃষক। প্রধানমন্ত্রী কৃষি যোজনার আওতায় যে ৬ হাজার টাকা করে কৃষকদের দেওয়া কথা, লকডাউনের মতো বিশেষ পরিস্থিতিতে ২ হাজার টাকা অগ্রিম এপ্রিলে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ৮.৭ কোটির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একজ কৃষকও নেই। কারণ মমতা ব্যানার্জী নিজের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের নাম এই প্রকল্পে নথিভুক্ত হতে দেননি। কেন্দ্র সরকারের চিকিৎসা বিমা আয়ুষ্মান প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গে লাগু হতে দেননি। ফলে করোনা বিপর্যয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে একটি বড়ো সুবিধা থেকে রাজ্যের মানুষ বঞ্চিত ট্রেনের ব্যবস্থা করলেও পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরানোর ব্যাপারে মমতা সরকারের চরম অনিহা। মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক জীবনে এরকম অমানবিক, অসংবেদনশীল আচরণের দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

মমতা ব্যানার্জির এই অমানবিক রাজনীতির প্রভাব রাজ্য প্রশাসন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নীচু তলাতেও সংক্রামিত হয়েছে। এ রাজ্যে কাটমানি ছাড়া কোনো কাজ হয় না। যে কোনো ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে ঘুষ অবশ্যম্ভাবী। রাজ্য প্রশাসনের সর্বত্র রন্ধ্রে রন্ধ্রে শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দৌলতে মানুষ দেখেছে সর্বস্ব খোয়ানো পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুলিশ তোলা তুলছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা করোনা বিপর্যয়ের সময় রেশনের চাল চুরি করছে। গরিব কল্যাণ যোজনার মাধ্যমে গরিব মানুষ যে পাঁচশো টাকা পেয়েছে নানা ছলচাতুরি করে সেখানেও ভাগ বসাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলে হয় মিথ্যে কেসে ফাঁসিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে অথবা সরাসরি উত্তম মধ্যম জুটছে। ফলে মানুষ এখন তিতিবিরক্ত, এটা বুঝতে পেরেই হয়তো মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে বলেছিলেন যদি মনে হয় আমরা পারছি না তাহলে আপনারাই রাজ্যটা চালান। পশ্চিমবঙ্গে এখন প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো উপায়ও হয়তো আর অবশিষ্ট নেই মমতার ঝুলিতে। সবমিলে বলা যায়, স্বখাতসলিলে ডুবছেন মমতা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

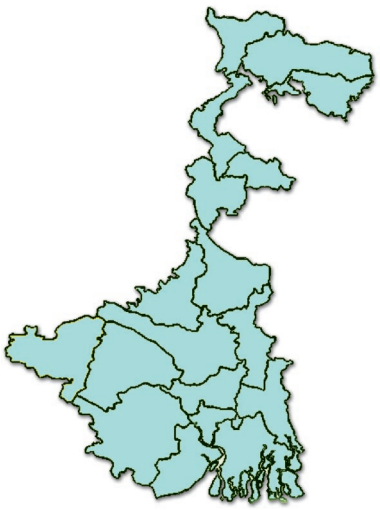

পশ্চিমবঙ্গ কেন চাই

বিনভূষণ দাশ

হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গ কেন চাই? পশ্চিমবঙ্গ তো আমাদের আছেই। তাহলে? অথবা প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে এভাবেও করা যায়— পশ্চিমবঙ্গ গঠন করতে হয়েছিল কেন? ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশ্ন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একই কথা কেন বলে যায়? হ্যাঁ, সত্যিই কেন আমরা পশ্চিমবঙ্গ চাই অথবা এই পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই একথা পুনরুচ্চারণ করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। কেন বঙ্গপ্রদেশ ভাগ করতে হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলেই কেন পশ্চিমবঙ্গ চাই সে কথার উত্তর পেয়ে যাব আমরা। কিন্তু তার আগে খুব সংক্ষেপে একটু বলে নিতে চাই আমরা 'বাঙ্গালি' কাকে বলব। এখানে আমরা বাঙ্গালির নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুসন্ধান না করে সাধারণভাবে 'বাঙ্গালি' বলতে আমরা কী বুঝি সেটাই বলছি।

ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, ''বেদের সময় থেকেই যখন ঋষি তাঁর এই ঋকমন্ত্র রচনা করেছিলেন— 'একম্ সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি' (যা আছে তা এক, ধীমান লোকেরা তাকে বহু বলে), তখন থেকেই এই সমন্বয়ের একটা সচেতন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই।'' বাস্তবে, আর্য-অনার্য সম্মিলনেই হিন্দুত্বের, হিন্দু জীবনবোধের সৃষ্টি হয়েছে। বাঙ্গালির এই জীবনবোধ আধুনিককালে শুরু হয়েছে রামমোহন রায়ের উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে নতুনভাবে আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ক্রমান্বয়ে এই ধারায় মিশেছে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বক্তৃতা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের সাধনা ও তাঁদের বাণী ও রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও রচনা এবং স্বদেশপ্রেম। বাঙ্গালির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আত্মবোধ, স্বদেশপ্রেম বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আত্মপ্রকাশ করলো। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, ''বাঙালি হিন্দুর যে আদর্শ, যে আশা-আকাঙ্ক্ষা এতদিন ধরিয়া তাহার জীবনের সব চেষ্টায় ও তাহার সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গলার বহু মুসলমান এখন স্বাত্মাভিমান হইয়া সেই আদর্শ ও সে সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাহার ধর্মের অনুমোদিত আধ্যাত্মিক আদর্শের এবং তাহার অর্থনৈতিক উন্নতির বিরোধী বলিয়া মনে করিতেছে। অল্পসংখ্যক বিদেশি তুর্কি মুসলমানের বাঙ্গলায় আগমনে ও তাহাদের রাজশক্তির প্রতাবে এবং ক্বচিৎ বিদেশি মুসলমান প্রচারক ও সাধকের প্রভাবে, বাঙ্গলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ অনেকে মুসলমান ধর্মকে স্বীকার করায় বাঙ্গালি মুসলমানের উদ্ভব হইল। সাত শত বৎসর ধরিয়া বাঙালি মুসলমান বাড়িয়া চলিয়া অবশেষে বাঙ্গলায় সংখ্যা-ভূয়ীষ্ঠ সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'' এটা দেখা গেছে যে, পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই মুসলমানরা একবার সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই বিচ্ছিন্নতাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যে দেশ তাঁরা দখল করে সেই দেশে হজরত মহম্মদের মজহব যথেচ্ছ প্রচারের সুযোগ যতদিন থাকে ততদিন তাঁরা সেটাই করে। যেমন ভারতবর্ষে যতদিন সুলতানি ও মোগল শাসন চালু ছিল ততদিন তাঁরা সেই শাসনের সুযোগ ও সাহায্য নিয়ে আগ্রাসীভাবে ইসলামের প্রচার করেছে। হিন্দু ও বৌদ্ধদের অবাধে ধর্মান্তরকরণ করেছে। বাঙ্গলায় সুলতানি ও নবাবি শাসনের সুযোগে অবাধে এই ধর্মান্তর চালিয়ে গেছে তাঁরা। ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই এ প্রক্রিয়া চলেছে। রাজশক্তির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মুসলমান পির, ফকির ও দরবেশদের দিয়ে তাঁরা এ কাজ করেছে। বাঙ্গলায় দীর্ঘ মুসলমান শাসনে তাঁরা ভূমিপুত্র হিন্দুদের উপরে অকথ্য অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ চালিয়ে গেছে। হিন্দুদের তাঁরা ভৃত্য করে রাখাতেই সচেষ্ট ছিল। বহিরাগত ধর্ম, ভাষা (ফারসি ও আরবি) হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় কোনো হিন্দু জমিদার অথবা শক্তিশালী শাসকের আবির্ভাব হলেই তাঁকে দাবিয়ে রাখা হতো। রাজা গণেশের অভ্যুত্থান এই সাক্ষ্যই দেয়। তাঁকে দমন করবার জন্য দলবেশ নুর কুতব আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শারকিকে চিঠি লিখে বাঙ্গলা আক্রমণ করে রাজা গণেশকে দমন করবার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে জৌনপুরের দরবেশ আশরাফ সিমনানিও তাঁদের সাহায্য করে। আবার নবাবি আমলের শুরুতে ভূষণার রাজা সীতারাম রায় শক্তিশালী হয়ে উঠলে তাঁকেও মেনে নিতে ও সহ্য করতে পারেনি মুসলমানরা। বাঙ্গলার তৎকালীন দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের বাধ্যকৃত সাহায্য নিয়ে তাঁর পতন ঘটান। অর্থাৎ বহিরাগত মুসলমান সুলতান ও নবাবেরা কোনো অবস্থায়ই বিন্দুমাত্র হিন্দু প্রাধান্য মেনে নিতে রাজি ছিল না। বাঙ্গলায় আরেক বিদেশি ইংরাজদের প্রাধান্য স্থাপিত হবার ফলে হিন্দুরা মুক্তির শ্বাস নেয়। ইংরাজ প্রাধান্যের সময়ে হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষা, চাকরিবাকরিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। অন্যদিকে দীর্ঘ মুসলমান সুলতানি ও নবাবি শাসন এবং ইংরাজ আমলে মুসলমানরা 'সুয়োরানি' সুলভ ব্যবহার পেলেও তাঁরা শিক্ষাদীক্ষা ও আর্থিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়ে নিজেদের গাফিলতি ও অলসতার কারণে। দীর্ঘ ইসলামি শাসনও তাঁদের উন্নতির সহায়ক হয়নি। এজন্য অবশ্যই তাঁরা নিজেরাই দোষী, দোষী তাঁদের স্বধর্মীয় সুলতান ও নবাবেরা।

সাধারণ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে, Divide et Empera বা ভাগ করে শাসন করার নীতি ইংরাজরা চালু করেছিল। এ কথাটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ দেশে বিভেদনীতি চালু করেছিল মুসলমান শাসকরা। তাঁরা এদেশে এসে শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি; এদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সবকিছুর উপরে তাঁদের আগ্রাসন চালিয়েছে কালাপাহাড়ীয় নির্মমতায়। কিছুই তাঁদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। যতদিন তাঁরা আশ্বস্ত ছিল যে তাঁরা এই দার-উল-হরব-কে নিজেরাই দার-উল-ইসলামে পরিণত করতে পারবে ততদিন তাঁরা এই দেশ খণ্ডিত করার কথা

ভাবেনি। কিন্তু ইংরেজ শাসনের শেষপ্রান্তে এসে যখন তাঁরা বুঝতে পারল, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই দেশের শাসনব্যবস্থা হিন্দুদের হাতে যাবে তাঁরা প্রমাদ গুনল। আর এই ভাবনা ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পরেই তাঁদের চিন্তায় এসেছিল। দেওবন্দপন্থী উলেমারা দেশভাগ করার কথা না ভেবে তখনো সারা ভারতকেই ইসলাম অধ্যুষিত করার চিন্তায় মশগুল থাকলেও আলিগড় অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমি যা পরবর্তীকালে আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিতে পরিণত তার প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এবং মুসলমান স্বাধিকারের পক্ষে আন্দোলন শুরু করলেন। যাইহোক, মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষবৃক্ষ বপন এখানেই হয়।

এই আলিগড় আন্দোলনেরই ফসল মহম্মদ আলি জিন্না ও তাঁর দোসরেরা।

দীর্ঘ মুসলমান শাসন যে এদেশে বিভেদের বীজ বপন করেছিল তা অনেক মুসলমান নেতাই প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছে। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁ কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর তো মনে হয়েছিল স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গঠিত হবার চেয়ে ইংরেজ শাসনই ভালো। আবার মুসলিম নেতা ভিকর-উল-মুলুক বলেছিনে, "আল্লাহ না করুন ভারতে যদি ইংরেজ শাসনের অবসান হয় তাহলে হিন্দুরা প্রভুত্ব করবে আর আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জন্য সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকব। এই বিপদ থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো ব্রিটিশ শাসনকে বজায় রাখতে সাহায্য করা" (India's Struggle for Independence, 1857-1947– Bipan Chandra & Others)। আবার গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী মুসলমান নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি তো পরিষ্কার স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এদেশে ভাগ করে শাসন করার হোতা তাঁরাই। ওই বৈঠকে আসীন ইংরেজ শাসকদের উদ্দেশ্যে তাঁর মন্তব্য, 'We divide and you rule.' আবার তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের আইনি ও সংবিধান উপদেষ্টা এইচ ভি হডসন তাঁর 'The Great Divide' গ্রন্থে লিখেছেন, "It is not possible to divide and rule unless the ruled are ready to be divide." বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এক জায়গায় বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে, এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।" আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, "আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।"

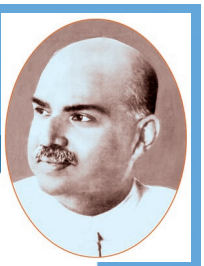

হিন্দু বিধায়কেরা চেয়েছিলেন বাঙ্গলাকে ভাগ করে স্বতন্ত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ গঠন করে বিভক্ত ভারতে হিন্দু বাঙ্গালির জন্য আলাদা বাসভূমি গঠন করতে। সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল, আইনসভার অনুমোদনে তার স্বীকৃতি মিলল। সৃষ্টি হলো হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গ। ড. শ্যামাপ্রসাদ ভারতের সংসদে নেহরুর সমক্ষে ঘোষণা করলেন, You have divided India, I have divided Pakistan.

অর্থাৎ বিভেদটা ছিলই, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে মুসলিম লিগ সেই বিভেদটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়, বিষময় করে তোলে। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনকে খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত করে তাতে ঘৃতাহুতি দেন। বিশের দশকের শুরুতে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে জুড়ে গান্ধীজী মুসলমানদের হৃদয় স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। যদিও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এই সংমিশ্রণ সেই সময়ে অনেকেই খুশি মনে মেনে নিতে পারেনি। প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল সেই সময়। কিন্তু ইতিহাসের প্রতিকূল স্রোতে হার মানতে হয়েছিল গান্ধীজীকে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির এই অশুভ মিলন মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলল। যেই না খিলাফত আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো এবং তুরস্কে খিলাফত পদটাই উঠে গেলো, গান্ধীর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সেই ভিত তখনই ভেঙে পড়লো। সেই ভাঙা সেতুকে জোড়া লাগানো আর গান্ধী মহারাজের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এর পরে আর মুসলমানরা কংগ্রেসের দিকে ফিরেও তাকায়নি।

এই ঘটনা এবং কংগ্রেসের বিশেষ করে গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর নানা ভুল সিদ্ধান্ত মুসলিম লিগকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করে। মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ধারাবাহিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ না দিয়ে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে নানা বিভেদমূলক কর্মপন্থা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার পথ গ্রহণ করে।

ভারতব্যাপী মুসলিম লিগের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর অংশ হিসেবে বাঙ্গলায়ও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে লিগ ও তার নেতারা। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে অন্যান্য কর্মসূচি ছাড়াও মুসলিম লিগ বাঙ্গালি মুসলমানদের কাছে প্রচার শুরু করে যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি মুসলমান ধর্মবিরোধী। সুতরাং প্রকৃত মুসলমানদের কাজ হবে উর্দু ভাষা ব্যবহার করা এবং ইসলাম তথা আরবি সংস্কৃতি গ্রহণ করা। এছাড়া বাংলার মধ্যে প্রচুর উর্দু ও আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ করানো হলো। বাঙ্গলার নানা প্রান্তে 'উর্দু অ্যাকাডেমি' গড়ে তুলে বাংলা ভাষা বিরোধী প্রচার শুরু হলো। সেই সময়ে ড. শ্যামাপ্রসাদ জিন্নাও তার লিগপন্থী সাগরেদদের এই প্রচার মেনে নিতে পারলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যপন্থী এবং বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির উন্নতিতে আস্থাশীল (যদিও দোদুল্যমান) নেতা এ কে ফজলুল হকের সঙ্গে যৌথভাবে এই উর্দু আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁদের দুজনের উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠল 'বেঙ্গলি প্রোটেকশন লিগ' নামে এক সংস্থা। এটির প্রতিষ্ঠাকাল, সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সাল। তাঁরা প্রচার করলেন, বাঙ্গালি মুসলমানেরা যেন উর্দুভাষীদের প্রচারে বিভ্রান্ত না হন। তাঁদের এই উদ্যোগ সফল

হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের প্রশ্রয়ে ও সমর্থনে তাঁরই দলের কাউন্সিলারদের উদ্যোগে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বাঙ্গলাকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন রাস্তার নামফলকে কেবলমাত্র উর্দু ও ইংরেজি ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উর্দুভাষী ছাত্র না থাকলেও উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে।

বাঙ্গলার মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ যথা এইচ এস সোহরাওয়ার্দি, আবুল মনসুর আহমেদ ও অন্যান্যরা তাঁদের ইপ্সিত পাকিস্তান প্রাপ্তির লক্ষ্যে নানাস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে হিন্দুদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করল। এই ধরনের একটা বড়ো পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তাঁরা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিতভাবে প্রথমে কলকাতায় ও পরে নোয়াখালিতে হিন্দু হত্যায় মেতে উঠে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ভোরবেলা থেকেই তাঁরা হিন্দুদের ওপর আক্রামণ শুরু করে দেয়। খুব ভোরেই হাওড়ার ঘুসুড়ি থেকে সশস্ত্র মুসলমান গুন্ডাবাহিনী গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় প্রবেশ করে আক্রমণ শুরু করে। এই হিন্দুহত্যা একনাগাড়ে তিনদিন চলে। অমানবিক বীভৎসতায় মানুষের রক্তে কলকাতার রাস্তাঘাট লাল হয়ে যায়। তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স লালবাজারে বসে হিন্দুদের ওপর এই হামলা পরিচালনা করেন। এটা যে লিগের পরিকল্পিত আক্রমণ ছিল তার অনেক তথ্য প্রমাণ বিদ্যমান। এরপরে, ওই একই সালের ১০ অক্টোবর, লক্ষ্মীপূজার দিনে মুসলিম লিগ গুন্ডা গোলাম সারোয়ারের নেতৃত্বে নোয়াখালিতে এক বীভৎস, একতরফা হিন্দু নরসংহার শুরু হয়। পরিকল্পিতভাবে হিন্দুগণহত্যা করা হয়।

আসলে এসবেরই লক্ষ্য বাঙ্গলার হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করে মুসলিম লিগের যে কোনো দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার প্রয়াস। স্বাধীনতার সময়ে সাধারণ বাঙ্গালি হিন্দুরা কোনো অখণ্ড, স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙ্গলার স্বপ্ন দেখেনি। তাঁরা ভারতবিচ্ছিন্ন কোনো বাঙ্গলার কথা ভাবেওনি, তাঁরা অখণ্ড ভারতের উত্তরাধিকারই চেয়েছিলেন। কিন্তু দেশভাগ ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে হঠাৎই তাঁরা শুনল, কয়েকজন নেতা স্বাধীন, সার্বভৌম, অখণ্ড বাঙ্গলার স্বপ্ন ফেরি করতে শুরু করেছে। বাঙ্গলাকে অখণ্ড রেখে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে একটা স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে বাঙ্গলাকে গণ্য করতে চাইছে। এই প্রস্তাবের পেছনে ছিলেন বাঙ্গলার তিন প্রভাবশালী নেতা। এঁরা হলেন, হাসান সাইদ সোহরাওয়ার্দি, লিগ নেতা আবুল হাশিম ও শরৎচন্দ্র বসু। পরে এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন কিরণশঙ্কর রায় ও যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। যদিও শেষোক্ত দুজন পরে এই পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে কলকাতা নরসংহারের কুখ্যাত নায়ক সোহরাওয়ার্দি সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতেন। তাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল না— না তাঁর দল মুসলিম লিগের কাছে না হিন্দুদের কাছে। গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন এবং বাঙ্গলার গভর্নর বারোজ দুজনেই তাঁকে সন্দেহ করতেন। প্রায় সাড়ে সাতশো বছর নিজেদের অর্থাৎ মুসলমান শাসন এবং দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে শাসকদের তাঁদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও মুসলমানেরা বিশেষ উন্নতি করতে পারেনি, কিন্তু দেশের শাসনের ওপর কর্তৃত্ব করবার ইচ্ছে তাঁদের ষোলোআনা ছিল। আর ইচ্ছে ছিল হিন্দুদের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাঁদের ওপর দমন পীড়ন চালানো। ১৯৪৬ এর ১৬ আগস্টের দাঙ্গাও এই পরিকল্পনারই অঙ্গ। তাঁরা এই দিনটিকে 'Direct Action Day' বা Day of Delivereance বা নিষ্কৃতি দিবস হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, কাদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি চাইছিল মুসলিম লিগ? মৌলানা আজাদের মতে, তাঁরা হিন্দুদের কাছ থেকে নিষ্কৃতি চাইছিল এটা পরিষ্কার। বস্তুত এটা ছিল লিগ ও লিগের গুন্ডাদের একটা পরীক্ষামূলক অভিযান। কিন্তু এই নরসংহার হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে এক দূরপনেয় সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি করে দেয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় হিন্দুদের এই বোধ হয় যে, মুসলমানদের সঙ্গে আর একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। এই ঐতিহাসিক সত্য তাঁরা ভুলতে পারেনি। মুসলিম লিগ ও জিন্না চেয়েছিল সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকেই তাঁর প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে। এ ব্যাপারে তার দোসর ও সহায়ক ছিল সোহরাওয়ার্দি। সুতরাং জিন্না যখন পাকিস্তান আদায়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন তখন তাঁর দোসর সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লিগের প্রক্সি প্ল্যান United, Independent, Sovereign Bengal বা অখণ্ড, স্বাধীন, সার্বভৌম বাঙ্গলার প্রস্তাব সামনে নিয়ে এলেন। যদিও এই প্রস্তাবটি বাঙ্গলার কোনো অংশেরই সমর্থন পায়নি।

এমতাবস্থায় তৎপর হয়ে উঠলেন বাঙ্গলার হিন্দু নেতারা। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তো ছিলেনই, সঙ্গে পেলেন হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায়চৌধুরী, সূর্যকুমার বসু প্রমুখ ব্যক্তিকে। বাস্তবে ১৯৪৬-এর ব্যাপক নরসংহারের সময়েই মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার জন্যই হিন্দু মহাসভা এই দাবি করে। আর সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে লিগ মন্ত্রীসভা নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়াতেই হিন্দুদের মধ্যে এই দাবির প্রতি সমর্থন ক্রমান্বয়ে বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার তিনদিনের সম্মেলন শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দু মহাসভা ভারতের মধ্যেই দুটি রাজ্য— হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ এবং মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ চেয়েছিল। মহাসভার ওই সম্মেলনে ৫ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভাষণে বললেন, ''I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let the two Major communities residing herein live in peace and freedom.'' উল্লেখ্য যে, শ্যামাপ্রসাদের এই বক্তব্যে কোনো সাম্প্রদায়িক সুর ছিল না। বরং কলকাতা ও নোয়াখালি দাঙ্গার মাধ্যমে মুসলিম লিগ প্রস্তাবিত পাকিস্তান হিন্দুদের কাছে কেমন হতে পারে তার একটা আস্বাদ দেবার যে চেষ্টা করেছিল তা থেকে হিন্দুদের মুক্তি দেবার চেষ্টা ছিল এই প্রস্তাবে। প্রায় একই সময়ে ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় 'বঙ্গবিভাগের' প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই সভায় বিশেষ আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ড. পি এন বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ, মাখনলাল সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। শ্যামাপ্রসাদ বলেন, ''This separation must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some form of a weak and loose centre encisaged in the Cabinet Mission Scheme is accepted by the Muslim League, We shall demand the creation of a new province composed of the Hindu Majority areas in Bengal.'' এছাড়াও সেই সময়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য বাঙ্গলার ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, ভাষাবিদ, আইনজ্ঞ-সহ সর্বস্তরের

বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন। সেই সময়কার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া লর্ড লিস্টওয়েলের কাছে 'পশ্চিমবঙ্গ' গঠনের জন্য ৭ মে, ১৯৪৭-এ তারবার্তা প্রেরণ করেন বাঙ্গলার পাঁচজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী — ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বৈজ্ঞানিকদ্বয় ড. মেঘনাদ সাহা ও ড. শিশিরকুমার মিত্র এবং ভাষাবিদ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ওই তারবার্তায় তাঁর লেখেন, ''Education, trade and Industry in Bengal have almost collapsed owing to recurrent riots, causing insecurity of life and property. The present communal Ministry (of H.S. Surawardy) is totally incapable of maintaining law and order. We strongly support the immediate formation of a separate West Bengal province guaranteeing under a non-communal Ministry, safety of life and unhindered progress in education, industry and commerce, with continuance and development of Calcutta–a vital part of West Bengal, as a moral, intellectual, social and economic centry.'' এই একই তারবার্তা তাঁরা Sir Stafford Cripps এবং-Sir John Anderson-কেও পাঠান। তাঁদের এই প্রস্তাবগুলোতে একটা বিষয় পরিষ্কার, তাঁরা ভারতের মধ্যেই বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য একটি আলাদা হিন্দু রাজ্য চেয়েছিলেন, ভারত বহির্ভূত কোনো আলাদা দেশ চাননি। পূর্বোক্ত পাঁচজন বুদ্ধিজীবী ছাড়াও আরও অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালি এ ব্যাপারে ড. শ্যামাপ্রসাদকে সাহায্য ও সমর্থন করেন। এঁরা হলেন ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, কবি ড. অমিয় চক্রবর্তী (এক সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন), বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ডিগ্রেসড ক্লাস লিগের সম্পাদক আর দাস, আইনবিদ নীহারেন্দু দত্তমজুমদার, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, বিমলচন্দ্র সিংহ, হিন্দু মহাসভার নেতা নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মার্কসবাদী নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা), মেজর জেনারেল এ সি চট্টোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ঋষি অরবিন্দ, কলকাতার তৎকালীন মেয়র এস সি রায়চৌধুরী প্রমুখ বাঙ্গলার বিশিষ্ট ব্যক্তি।

পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলো পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে চেষ্টা করেন ঐতিহাসিকদ্বয় স্যার যদুনাথ সরকার ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। তৎকালীন বাঙ্গলার কিছু বৃহৎ জমিদারও 'পশ্চিমবঙ্গ' সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাব, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দী, মহারাজা প্রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজকুমার শীতাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী (সিপিএম নেতা স্বর্গত স্নেহাংশু আচার্যের পিতৃদেব) প্রমুখ অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। জিন্না যে যুক্তিতে ভারত ভাগ করতে চেয়েছিলেন সেই যুক্তিতেই শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলা ভাগ করতে চেয়েছিলেন। ফলে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও লিগ এর বিরোধিতা করার যুক্তি খুঁজে পায়নি। কিন্তু জিন্না ও সোহরাওয়ার্দি তাঁদের হতাশা গোপন করতে পারেনি। অবস্থা বৈগুণ্যে জিন্নাও শেষ অবধি অখণ্ড বাঙ্গলা প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তার অভিসন্ধি ছিল, '...an independent Bengal would be a sort of Subsidiary Pakistan...'' কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টায় তার সে স্বপ্নও অপূর্ণ থেকে গেছে।

এছাড়াও সেই সময়ে ইংরেজি সংবাদপত্র অমৃতবাজার পত্রিকা এক জনমত সমীক্ষার আয়োজন করে যাতে ৯৮ শতাংশ মানুষ হিন্দুদের জন্য বঙ্গবিভাজনের পক্ষে রায় দেন। শেষে ড. শ্যামাপ্রসাদ গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনকে ১৯৪৭ সালের ২ মে ৯ দফা যুক্তি দেখিয়ে আবেদন করে 'বঙ্গ বিভাজন'-এর প্রস্তাব কার্যকর করার আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, ''"Both the provinces should remain within the union of India. If however India is to be divided on communal consideration, partition of Bengal becomes an immediate necessary." এর এক মাস পরে ১৯৪৭-এর ২ জুন বঙ্গবিভাজন ও দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ২ জুনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা হিন্দুপ্রধান এলাকা ও মুসলমান প্রধান এলাকা অনুযায়ী আলাদা হয়ে দুটি আলাদা অধিবেশনে সমবেত হন। একজন খ্রিস্টান সদস্য ও পাঁচজন হিন্দু সদস্য বাদে বাকি সব হিন্দু সদস্য বঙ্গবিভাগের পক্ষে তাঁদের ভোট দেন। হিন্দু বিধায়কেরা চেয়েছিলেন বাঙ্গলাকে ভাগ করে স্বতন্ত্র 'পশ্চিমবঙ্গ' প্রদেশ গঠন করে বিভক্ত ভারতে হিন্দু বাঙ্গালির জন্য আলাদা বাসভূমি গঠন করতে। সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিল, আইনসভার অনুমোদনে তার স্বীকৃতি মিলল। সৃষ্টি হলো হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থান **পশ্চিমবঙ্গ**। ড. শ্যামাপ্রসাদ ভারতের সংসদে নেহরুর সমক্ষে ঘোষণা করলেন, You have divided India, I have divided Pakistan.

বড়ো অশান্ত সময় চলছে শ্যামাপ্রসাদের এই পশ্চিমবঙ্গে। এখানকার রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এই রাজ্যে এখন একদিকে সোহরাওয়ার্দির আদর্শকে সামনে রেখে এক বৃহত্তর ইসলামিক বাঙ্গলা গঠনের প্রয়াস চলছে। অন্যদিকে এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর চলছে উর্দুভাষীদের আগ্রাসন। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন অংশ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন অংশে সশস্ত্র মুসলমান গুন্ডাদের তাণ্ডব চলেছে। আবার মধ্যবঙ্গে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সামনে রেখে এক নবাবি বাঙ্গলার খোয়াব দেখছে কেউ কেউ। পশ্চিমবঙ্গের অহিন্দু জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তাই এই খোয়াব প্রতিহত করবার সময় হয়েছে। উচৈঃস্বরে বলার সময় এসেছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গকে নষ্ট হতে দেব না। আমরা ড. শ্যামাপ্রসাদের সৃষ্ট হিন্দু বাঙ্গালির বাসস্থান পশ্চিমবঙ্গকে চাই, তাঁকে বুক দিয়ে আগলে রাখবই।

ভাগ করে শাসন করার নীতি ইংরাজরা চালু করেছিল। এ কথাটা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। এ দেশে বিভেদনীতি চালু করেছিল মুসলমান শাসকরা। তাঁরা এদেশে এসে শাসন করেই ক্ষান্ত হয়নি; এদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সবকিছুর উপরে তাঁদের আগ্রাসন চালিয়েছে কালাপাহাড়ীয় নির্মমতায়।

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের প্রাসঙ্গিকতা

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

''সেই রাত্রেই কুখ্যাত মৃত্যুদূতেরা সশস্ত্র হয়ে হানা দিল আমাদের বাড়িতে। লাথি মেরে দরজা ভেঙে টেনে বের করল বাবা মামা আর দাদাদের। রাইফেল উঁচিয়ে টেনে নিয়ে গেল অন্ধকারে। আধো অন্ধকারে তাদের চেনা গেল। তারা আমাদের গ্রামের হাতেম আলি, রহমান মিয়া আর বাসাবাটির মওলানার মদতপুষ্ট এনায়েতের ভাই ছোট্টু। তাদের আরও দুই সঙ্গী বিষ্ণুপুর কলাগাছিয়ার দুই দুষ্কৃতী। মা মঞ্জুকে বুকে জড়িয়ে অন্ধকার ঠাকুর ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। মায়ের বুক থেকে হ্যাঁচকা টানে ওরা ছাড়িয়ে নিল মঞ্জুকে। মা উপুড় হয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল একজনের পা। চিৎকার করে উঠল— তোমাদের পায়ে পড়ি ওকে ছেড়ে দাও। একটা লাথি পড়ল মা'র মুখে। অন্ধকার রাত ভেদ করে 'বাঁচাও, ও মা আমাকে বাঁচাও' আর্ত চিৎকারে কেঁপে উঠল সারা গ্রাম। পুঁটিমারি নদীর তীর থেকে সে আর্তনাদ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেল। অন্ধকার রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে ছুটেও মা মঞ্জুকে বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারল না!

'নিদ্রাহীন অমানিশা শেষ হবার আগেই মা ভাইদের নিয়ে ছুটলেন। পথঘাট পেরিয়ে গিয়ে উঠলেন খাড়াসম্বল মামাবাড়ি। মা-কে সান্ত্বনা দেবার মিথ্যা চেষ্টা! সেই শাবকহারা পাখির আর্তনাদে আকাশ- বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল। বাবা রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে গেছেন কেউ জানে না। সকালবেলা গ্রামের একজন মুসলমান অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে মঞ্জুর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বস্ত্রহীন দেহটা পুঁটিমারির পাড় থেকে তুলে এনে এক টুকরো বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিল। আমাদের বাড়ির একপ্রান্তে ওরাই ওকে বয়ে এনে শেষশয্যায় শুইয়ে দিল। মঞ্জুর হাতের লাল চুড়ির টুকরোগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল পুঁটিমারির কাদামাটির কূলে।'' এই স্মৃতিচারণাটি সুদীপ অধিকারীর। সবকিছু খুইয়ে বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলা থেকে তিনি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। তার এই স্মৃতিচারণাটি প্রকাশিত হয়েছে 'হৃদয়ের টুকরোয় গাঁথা' শীর্ষক এক সংকলনে।

বাংলাদেশে কিশোরী পূর্ণিমা শীলের ওপর নির্যাতনের ঘটনাটিও সর্বজনবিদিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন পূর্ণিমা। তিনি যখন কিশোরী, তখন এক রাতে তাদের বাড়িতে হানা দেয় মুসলমান জেহাদিরা। পূর্ণিমাকে তারা একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে। পূর্ণিমার অসহায় মা সেই মুসলমান ধর্ষকদের পা ধরে অনুনয় করেছিলেন— 'বাবা, আমার মেয়েটা বড্ড ছোটো। তোমরা একসঙ্গে সবাই ওর কাছে যেও না। ওর কষ্ট হবে। একজন একজন করে যাও।' একজন মা কতখানি অসহায় হলে এইরকম আর্তি করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। আগরতলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক অরবিন্দ মাহাতো বাংলাদেশে তার একটি অভিজ্ঞতার কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় এক হিন্দু শিক্ষকের সঙ্গে অরবিন্দবাবুর আলাপ হয়েছিল। ওই হিন্দু শিক্ষকের স্ত্রীকে স্থানীয় মুসলমান মাতব্বরেরা মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। দু-তিনদিন আটকে রেখে ধর্ষণ করে। তারপর আবার বাড়িতে ফেরত দিয়ে যায়। শুধু ওই শিক্ষকের স্ত্রী নয়, হিন্দু পরিবারের তরুণী-যুবতীদের ভাগ্যে প্রায়শই এরকম ঘটে থাকে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯

শ্যামাপ্রসাদ নির্যাতিত হিন্দুর জন্য পশ্চিমবঙ্গ আদায় করে দিয়ে গিয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদের সেই লড়াই সম্পূর্ণ হবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সফল প্রয়োগে।

এই ঘটনাগুলি যে খুব বিচ্ছিন্ন ঘটনা— ঠিক এমন নয়। চল্লিশের দশক থেকে এই পর্যন্ত— তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমানে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সঙ্গে নিত্যদিন এই রকমই ঘটে চলেছে। হিন্দুদের খুন, হিন্দুর সম্পত্তি লুটতরাজ এবং হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ ও অপহরণ, ধর্মান্তরণ— এতে একদিনের জন্যও বিরতি পড়েনি। বাংলাদেশেই প্রকাশ্যে দেওয়াল লেখা হয়েছে— 'একটা-দুইটা হিন্দু ধর/সকাল বিকাল নাস্তা কর।' অতীতে পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে বাংলাদেশ— এশিয়া মানচিত্রের এই অঞ্চলটিতে অবাধে চলছে এথনিক ক্লিনজিং।

এই অঞ্চলটিতে যে এভাবেই হিন্দুরা অত্যাচারের শিকার হবে— তাদের জীবন সংকট হবে, একথা বুঝেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিশেষ করে ভারতের শরীরের থেকে পাকিস্তান ছিনিয়ে নেওয়ার উদগ্র বাসনায় জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগ যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলকাতায় অবাধে হিন্দু ও শিখ নিধন চালিয়েছিল এবং তৎপরবর্তীতে ওই বছরই অক্টোবর মাসে নোওয়াখালিতে অবাধে হিন্দু হত্যা করেছিল, তখনই শ্যামাপ্রসাদ-সহ অন্য অনেকেই বুঝে গিয়েছিলেন— জিন্নাহর মুসলিম লিগের শাসনে হিন্দুরা আদৌ নিরাপদ নয়। জিন্নাহ তার যে স্বপ্নের পাকিস্তানের পরিকল্পনা করেছিলেন, তার ভিতর সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে ধরেছিলেন। বিশেষ করে কলকাতার দখলদারি চেয়েছিলেন জিন্নাহ্। শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন, জিন্নাহ যদি তার দাবিমতো সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন— তাহলে

বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। যে কারণেই ভারত ভাগের সঙ্গে বঙ্গবিভাগের দাবি সেদিন জানিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তার সঙ্গে সেদিন ছিলেন বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা, ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও যদুনাথ সরকার, রাজনীতিবিদ সুচেতা কৃপালনি এবং এন সি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বঙ্গপ্রদেশের যে অংশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অংশটি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গকে ভারতে রেখে দিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁরা। বাঙ্গালি হিন্দুর স্বার্থেই তাঁরা সেদিন পশ্চিমবঙ্গের দাবিতে সরব হয়েছিলেন।

জিন্নাহর পাকিস্তানে যে হিন্দুরা কখনই নিরাপদ নয়, তা আরও একজন বুঝেছিলেন। তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। গান্ধীর না বোঝার কোনো কারণও ছিল না। ১৯৪৬-এ নোয়াখালিতে হিন্দু নিধনে গান্ধী গিয়েছিলেন সেখানে। স্বচক্ষে দেখেছিলেন পরিস্থিতি। নোয়াখালির মুসলমানরা গান্ধীকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, তাদের স্বপ্নের পাকিস্তানে তারা হিন্দুদের চায় না। ওই সময় দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার একটি রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, নোয়াখালির একটি গ্রামে গান্ধীজী সভা করতে গিয়েছেন। সেই গ্রামটি তখন হিন্দুশূন্য। সভায় মুসলমানরা শুধু গান্ধীজীর বক্তব্য শুনতে এসেছে। গান্ধীজী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন— 'আপনারা কী চান না হিন্দুরা এই গ্রামে আবার ফিরে আসুন?' স্টেটসম্যান লিখেছে— ''গান্ধীর কথার উত্তর না দিয়ে মুসলমানরা সভা ত্যাগ করে চলে গেল। বুঝিয়ে দিয়ে গেল, তারা চায় না হিন্দুরা আর এখানে ফিরুক। মুসলমানদের এই মনোভাব দেখে গান্ধী বুঝেছিলেন, জিন্নাহর পাকিস্তানে হিন্দুরা অসম্মানের জীবন যাপন করবে। সে কারণেই ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে দিল্লিতে দুটি জনসভায় পাকিস্তানে যেসব হিন্দুরা থেকে যাবে, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ফেলেছিলেন গান্ধী। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে দিল্লিতে একটি সভায় গান্ধী বলেছিলেন, 'যেসব হিন্দুরা পাকিস্তানে থেকে যাবে তাদের মনে একটা ভয় কাজ করবে। নিরাপত্তা হীনতায় ভুগবে তারা। তারা যদি নিরাপত্তার জন্য, জীবন জীবিকার জন্য তখন ভারতে আশ্রয় নিতে চায়— ভারতের উচিত হবে ভাইয়ের মতো দু'হাত বাড়িয়ে তাদের গ্রহণ করা।" ওই ১৯৪৭-এর জুলাই মাসেই দিল্লিতে আর একটি সভায় গান্ধী বললেন— 'আমার এক বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমরা যখন ১৫ আগস্ট এখানে উৎসব করব, তখন পাকিস্তানে যেসব হিন্দুরা থেকে গেল— তারা কী করবে— সেটা কী কখনো ভেবে দেখেছি আমরা?'

বাঙ্গালি হিন্দুকে একটি নিজস্ব আবাসভূমির সন্ধান দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। জিন্নাহর করালগ্রাস থেকে অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলটি তিনি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। যদি শ্যামাপ্রসাদ সেদিন এ কাজে ব্যর্থ হতেন— তাহলে বাঙ্গালি হিন্দুকে কেমন অসম্মানের জীবন যাপন করতে হতো— আজকের বাংলাদেশ তার প্রমাণ। এ হলো ইতিহাসের একটি পর্ব। কিন্তু এতেই শ্যামাপ্রসাদের আরব্ধ কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল না, অথবা এরকমও মনে করার কোনো কারণ নেই, পশ্চিমবঙ্গ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বাঙ্গালি হিন্দুসমাজ নিরাপদ হয়ে পড়ল। তাদের জীবন ও জীবিকার আর কোনো সংকট রইল না। মনে রাখতে হবে, দেশভাগের পরেও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজের একটি অংশ রয়ে গেছে। নানা কারণে, দেশভাগের সময় বা পরবর্তীতে তারা এদেশে আসতে পারেননি বা পারছেন না। তারাই প্রতিনিয়ত পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন, বাংলাদেশেও হচ্ছেন। অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে উঠলে এদের একটি অংশ সীমান্ত পেরিয়ে এই বঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৫০-এ এবং সত্তরের দশকে দু-দুবার বিপুল পরিমাণে হিন্দু শরণার্থী এসে আশ্রয় নিয়েছিল এই বঙ্গে। এছাড়াও, তথ্যেই প্রকাশ প্রতি বছর গড়ে পাঁচশোরও বেশি শরণার্থী এদেশে আশ্রয় নিতে আসে। এদেশে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এই হিন্দু শরণার্থীদের আশ্রয় নিতে আসার কারণ এই যে, দেশভাগ হয়ে গেলেও ভারতকে এরা মনে করে প্রধানত হিন্দুদের দেশ। এবং পশ্চিমবঙ্গে এদের জীবন জীবিকা সুরক্ষিত হবে— এমনটাই ধারণা করে এরা।

দেশভাগ হলেও তদানীন্তন পাকিস্তানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হবেই— এরকম একটি ধারণা ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের ছিলই। সে ধারণা ভুলও ছিল না। সেই আশঙ্কা থেকেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী থেকে বল্লভভাই প্যাটেল প্রত্যেকেই বলেছেন, এই নির্যাতিত মানুষগুলির প্রতি ভারত দায়বদ্ধ। কাজেই এরা যদি জীবন ও নিরাপত্তার খোঁজে ভারতে আশ্রয় চায়, তাহলে তাদের আশ্রয় দেওয়াটা হবে ভারতের কর্তব্য। এই শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় সংসদও বিভিন্ন সময় সরগরম হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে, যখন তদানীন্তর পূর্ব পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হিন্দু শরণার্থীর ঢল ভারতে এসে পৌঁছেছিল, তখন সংসদে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু স্বয়ং বলেছিলেন--- 'এই শরণার্থীদের আশ্রয়দানের বিষয়ে চলতি নাগরিকত্ব আইনে কিছু সংশোধনী আনতে হবে।' এর পরেও এই শরণার্থীদের বিষয়ে সংসদে একাধিকবার সরব হয়েছেন বিশিষ্ট বামপন্থী সংসদ ভূপেশ গুপ্ত, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দ, এমনকী বাসুদেব আচার্য, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মতো সিপিএম সাংসদরাও। প্রত্যেকের বক্তব্যেই একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, এই অত্যাচারিত, নির্যাতিত শরণার্থীদের প্রতি ভারত তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য এড়িয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু এতকিছু বলার পরেও, এই নির্যাতিত লাঞ্ছিত শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য কর্মটুকু এরা সম্পাদন করেনি। অর্থাৎ দেশের নাগরিকত্ব আইনটি সংশোধন করে এদের পাকাপাকিভাবে ভারতের নাগরিকত্ব প্রদান করে জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা করার কাজটি কেউ করেনি। এই কাজটি এতদিন পরে করল নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতীয় জনতা পার্টি তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতিটি নরেন্দ্র মোদীর সরকার পালন করেছে। এখন এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের জাতীয় নেতৃত্বও কিন্তু দেশভাগের পরবর্তী সময়ে শরণার্থী সমস্যাকে মানবিক দৃষ্টিতেই দেখার কথা বলেছিলেন। কুযুক্তির জালে বিষয়টিকে জড়িয়ে দিতে তারা চাননি। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আগত নির্যাতিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এদেশে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এই সংশোধিত আইনে এও বলা হয়েছে, এদেশে বসবাসকারী মুসলমানরা কোনোরকম নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না। কুযুক্তি তোলার কোনো অবকাশই রাখেনি এই সংশোধিত আইনটি। পুঁটিমারির মঞ্জু বা কিশোরী পূর্ণিমাদের অত্যাচার, অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি দেবার কথা বলেছে এই আইনটি। শ্যামাপ্রসাদ নির্যাতিত হিন্দুর জন্য পশ্চিমবঙ্গ আদায় করে দিয়ে গিয়েছেন। শ্যামাপ্রসাদের সেই লড়াই সম্পূর্ণ হবে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের সফল প্রয়োগে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্ম

বাঙ্গালি শুধু আত্মবিস্মৃত নয়, ইতিহাস চর্চায় উদাসীনও বটে

প্রবীর ভট্টাচার্য্য

সময় ১৯০৫

প্রতিবাদ! প্রতিবাদ! প্রতিবাদ :

গত কয়েকশো বছরে বাঙ্গালির বুকে এত বড়ো মৃত্যুবাণ আর বাজেনি। এই মৃত্যুবাণের আর এক নাম বঙ্গভঙ্গ। বড়লাট কার্জনের তিন বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ উঠেছিল।

প্রতিবাদের একই সূত্রে মিলেছিল সেদিন সমগ্র বঙ্গভূমি। মিলেছিল অভিজাত-অভাজন শ্রেণীর মানুষ। কে ছাপছে, কে ছড়াচ্ছে কেউ জানে না। কেবল হাতে হাতে ঘুরছে হাজার হাজার ইস্তেহার, হাতের মুঠোকে বজ্রমুষ্টি করে তোলার ডাক দিয়ে। বাঙ্গলার পত্রপত্রিকায় জ্বালাময় অক্ষরে লিখে চলেছে একটি জ্বলন্ত শব্দ— প্রতিবাদ।

প্রস্তাব বঙ্গভঙ্গ :

ইংরেজ একটা জিনিস হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল যে, ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান শত্রু বাঙ্গালি, যাঁরা পাশ্চাত্যের ধাঁচে শিক্ষিত। ইংরেজি শিক্ষাই এদের হাতে তুলে দিয়েছে ইংরেজ নিধনের হাতিয়ার। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই চিনেছে পাশ্চাত্য স্বাধীনতার স্বরূপ। তাই নেমেছে স্বাধীনতার আস্বাদন লাভে। ইংরেজ প্রভুত্বের খুঁটি নাড়ানোর প্রচেষ্টায়। বুদ্ধিমান কার্জন অল্প চিন্তাতেই বুঝে নিয়েছিলেন বাঙ্গালিকে খর্ব করার চরম অস্ত্র একটাই। যেটা তার শিক্ষাদীক্ষা, রাজনৈতিক চেতনা, সাহিত্যের গৌরবকে অকালমৃত্যুর অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে পাঠানো। অস্ত্র হবে উচ্চ শিক্ষার সংকোচন। ১৯০৪ সালে কার্জন ইউনিভার্সিটি বিল পাশ

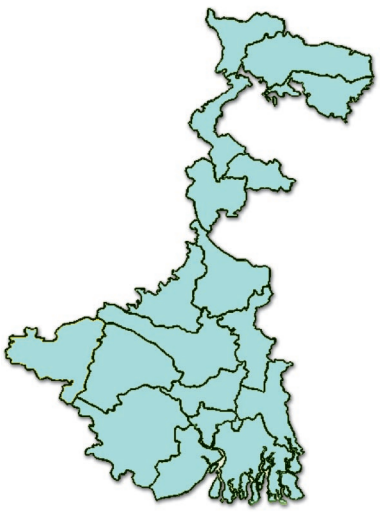

করালেন। এর আগে ১৯০৩ সাল থেকেই চলছিল প্রস্তুতি। কার্জনের শেষ ব্রহ্মাস্ত্র। বঙ্গভঙ্গ।

বাঙ্গলা মানে :

বাঙ্গলা বলতে বোঝাত সিলেট, গোয়ালপাড়া, গারো পাহাড় পর্যন্ত। ১৮৭৪ সালে বাঙ্গলা থেকে অসমকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হলো। তৈরি হলো নতুন অসম প্রদেশ। সিলেট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া তিনটি বাংলা ভাষাভাষী জেলাকে বাঙ্গলার মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হলো অসম প্রদেশে। ১৯০৩ সালে নতুন করে স্থির হলো চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ যোগ হবে অসমের সঙ্গে।

দেশদ্রোহিতা :

ময়মনসিংহের জমিদার শক্ত শিরদাঁড়ার মানুষ। কার্জন সাহেব তাঁর বাসভবনে অতিথি হয়ে এলে মহারাজা আপ্যায়নের ত্রুটি রাখলেন না। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন কার্জনের প্রস্তাব।

এরপরে কার্জন গেলেন ঢাকায়। সেখানে এক বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে বসলেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকার মুসলমানদের কী কী সুবর্ণ সুযোগ মিলবে দিলেন তার ফিরিস্তি। প্রস্তাব কার্যকর হলে ঢাকাই হবে নবগঠিত প্রদেশের রাজধানী। বাড়বে মুসলমানদের ঐক্য। তারা বড়ো হবার এমন সুযোগ পাবে যা মুসলমান রাজাদের আমলেও হয়নি। কার্জন সার্থক হলেন। মন গলল ঢাকার নবাব সলিমুল্লার। রাজি বঙ্গবিচ্ছেদে। দেশদ্রোহিতার বিনিময়ে তিনি পেলেন নগদ দশ হাজার পাউন্ড। এই উৎকোচের আসল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানকে জমি ছিনিয়ে নিতে হবে হিন্দুর উষ্ণবুকের পাশ থেকে, নিবিড় আলিঙ্গন থেকে। ইতিমধ্যেই কার্জনের জুটে গেল আর এক সঙ্গী। ময়মনসিংহের এক ক্ষুদে জমিদার নবাব আলি চৌধুরি।

মুসলিম লিগ ও হিন্দু গণহত্যা :

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন একদিকে যেমন পূর্ণ স্বদেশী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যা ব্রিটিশ ভারতের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল, সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল, ঠিক তেমনি সেই সময়েই তৈরি হয় মুসলিম লিগ, দেশদ্রোহিতার অনন্য নজির, যা দেশকে টুকরো করে ফেলেছে।

ঢাকার শাহবাগে ১৯০৬-এর ২৮-৩০ ডিসেম্বর প্রায় আট হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ, আগা খান প্রমুখ মুসলমান নেতা সেদিন ভারতবিদ্বেষের যে বীজ বপন করেছিল তার রেশ বয়ে চলল আরও চার দশক।

২৯ জুলাই ১৯৪৬। বোম্বাইতে মুসলিম লিগের অধিবেশনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেন জিন্না। বলেন, আমি নীতিকথার আলোচনায় যেতে চাই না। আমাদের হাতে বন্দুক আছে এবং আমরা তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

লাঠিসোঁটা ও অন্যান্য অস্ত্র হাতে কলকাতার রাস্তায় জড়ো হয় পঞ্চাশ হাজার জেহাদি মুসলমান, যা তখনকার সবচেয়ে

বড়ো সমাবেশ। মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামদিবসের ডাকে তারা হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদে প্রস্তুত। মঞ্চে উপবিষ্ট মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ হোসেন সুরাবর্দি, খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাসিম, এম এস ইস্পাহিনি ও তপশিলি মোর্চার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সমবেত মুসলমান জনতাকে বললেন, ''সেনা ও পুলিশকে সংযত করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম— যা করতে পারিস কর।''

ময়দানে সভা ভাঙতেই উন্মত্ত মুসলমান জনতা আক্রমণ করে হিন্দু জনতা ও দোকানপাটের ওপর! ক্যানিং স্ট্রিট, ওয়েলেসলি স্ট্রিট, কর্পোরেশন স্ট্রিট, ধর্মতলা স্ট্রিট, মানিকতলা রোড, বিবেকানন্দ রোডে গণলুঠ হয়। বিখ্যাত দোকান কমলালয় স্টোর্স, ভারতকলা ভাণ্ডার, লক্ষ্মী স্টোর্স লুঠ হয়। উত্তর ও মধ্য কলকাতার হিন্দুপাড়াগুলি আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হয় গড়পাড়, নারকেলডাঙা, ফুলবাগান, বেলেঘাটা, পার্ক সার্কাস, কলুটোলা, চিৎপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি হিন্দু বাড়ি। অভিনেতা ছবি বিশ্বাস থেকে গণিতজ্ঞ যাদব চক্রবর্তী, রাজা দেবেন্দ্র মল্লিক থেকে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এস এন মুখার্জি। কেউই সেদিন রেহাই পাননি। ক্যানেল ওয়েস্ট স্ট্রিট, গ্যাস স্ট্রিট, ফিরার্স লেন, মেটিয়াবুরুজ, লিচু বাগান প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

এই হত্যালীলা অপরিকল্পিত ছিল না, বরং নাৎসি পার্টির ইহুদি গণহত্যার দ্বারা অনুপ্রাণীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার ও নাৎসি পার্টির ইহুদি বিদ্বেষ, মুসলমান নেতাদের হিটলারের প্রতি অনুরক্ত করে তোলে। বসনিয়া-ক্রোয়েশিয়ার হাজার হাজার মুসলমান, নাৎসি পার্টির মিলিয়েশিয়ায় যোগদান করে এবং ব্যাপক হারে সার্ব নিধন যজ্ঞে মেতে ওঠে। ভারতের মুসলিম লিগও ব্যতিক্রমী ছিল না। নাৎসি পার্টির ধাঁচে গড়ে ওঠে মুসলিম ন্যাশানাল গার্ড। ১৬ আগস্টের জন্য তাদের পুরোদমে চলতে থাকে রণ প্রস্তুতি। টানা দুদিন এক তরফা মার খেয়ে ১৭ আগস্ট হিন্দুরা বিভিন্ন আখড়া ও ব্যায়াম সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত

দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে আলোচনারত ডঃ আম্বেদকর ও শ্যামাপ্রসাদ। (১৯৪৯)

হয়ে শুরু করে পালটা মার। গোপাল মুখার্জি, যুগল ঘোষ, ভানু বোসরা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে শুরু করে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ। হতাশ সুরাবর্দি নিরুপায় হয়ে রণে ভঙ্গ দেন। এদিকে পাকিস্তান দাবির উন্মত্ততায় পূর্ববঙ্গ তখন বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা বাঙ্গলার দ্বিতীয় ও চতুর্থ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন শুরু হয় হিন্দুদের সার্বিক গণহত্যা, ধর্ষণ ও গণধর্মান্তরকরণ। শয়ে শয়ে আক্রান্ত হয় নমঃশূদ্র, কৈবর্ত ও যুগীবাড়ি। নষ্ট করা হয় মাছ ধরার জাল ও নৌকা, তাঁতির তাঁর ও সুতো। শুধুমাত্র টাকাপয়সা, সোনাদানা লুঠ করা হয়নি। বরং টিনের চাল, বেড়ার দেওয়াল, কাঠের দরজা এমনকী পরনের কাপড়টিও লুঠ করা হয়। পুরুষদের কুপিয়ে অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয় এবং পরিবারের নারীদের গণধর্ষণ করা হয়। তারপর নারীদের মাটিতে ফেলে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দিত মৌলবিরা। বিয়ে দিয়ে দিত কোনো এক ধর্ষকের সঙ্গে। নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় আক্রান্ত হয়েছে অগণিত মন্দির ও হিন্দুদের ঠাকুর ঘর, গোমাংস নিক্ষেপ করে অপবিত্র করা হয় মন্দির এবং দেওয়ালের সর্বত্র লিখে দেওয়া হয় আল্লাহু আকবর।

শ্যামাপ্রসাদ ও পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব :

বেসরকারি মতে নোয়াখালির গণহত্যায় পাঁচ থেকে দশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যে আছড়ে পড়ে হাজার হাজার বাঙ্গালি উদ্বাস্তু। এভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনের চারাগাছটি একটু একটু করে বিষবৃক্ষের মতো বেড়ে উঠছিল। শ্যামাপ্রসাদ এই বিষবৃক্ষের সম্ভাবনা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। হিন্দু মহাসভা ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সংগঠনের সহায়তায় শ্যামাপ্রসাদ পাকিস্তান আন্দোলনের অঙ্কুরেই বিনাশ করার সংকল্প নেন। এই সময়ে বাবাসাহেব আম্বেদকারের ভূমিকাও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালে লিখিত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও পাকিস্তান দাবি নিয়ে লিখিত তাঁর বই—

পাকিস্তান অর দ্য পার্টিশান অব ইন্ডিয়া। সেখানে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে একজন হিন্দু, সে যে বর্ণেরই হোক না কেন, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার বই আর কিছুই নয়। তার এই সিদ্ধান্ত বাঙ্গলার তপশিলি সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে বাঙ্গলাভাগের পক্ষ নিতে অন্তত নৈতিক সমর্থন জানাতে সহায়তা করে। অবশেষে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের বাঙ্গালি এগিয়ে আসেন বাঙ্গলায় হিন্দু বাসভূমি গড়ার লক্ষ্যে।

১৯৪৬-এর শেষের দিকে বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কৃষক নেতা হেমন্ত কুমার সরকার, শ্যামাপ্রসাদ ও অন্যান্য বাঙ্গালি হিন্দু নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ গঠনের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা ভাগ করে বেঙ্গল পার্টিশন লিগ তৈরি করেন। ১৫ মার্চ, ১৯৪৭-এ শ্যামাপ্রসাদ কলকাতায় অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে বাঙ্গালি হিন্দুর স্বভূমির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যকে পূর্ণ সমর্থন জানান। ২৯ মার্চ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বঙ্গভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দেন বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতাব, কাশিম বাজারের শীশচন্দ্র নন্দী-সহ বাঙ্গলার অন্যান্য জমিদার। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসম্মেলনে নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি বলেন, বাঙ্গলাভাগ বাঙ্গালি হিন্দুদের জীবনমরণের প্রশ্ন। শ্যামাপ্রসাদ বাঙ্গলাভাগকে হিন্দুস্বার্থ সুরক্ষার একমাত্র পথ বলে তুলে ধরেন। ৪ এপ্রিল বঙ্গীয় কংগ্রেস অধিবেশনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব শ্যামাপ্রসাদের উপস্থিতিতে বাঙ্গলাভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ২৩ এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে নেওয়া ৫ লক্ষাধিক মানুষের ৯৮ শতাংশ বাঙ্গালি হিন্দু বাসভূমির পক্ষেই রায় দেন। ২৩ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদের ডাকেই কলকাতায় পরিবহণ ধর্মঘট হয়। পার্টিকে তোয়াক্কা না করে কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ট্রাম কোম্পানি কর্মচারী ইউনিয়ানের সদস্যরা শ্যামাপ্রসাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ধর্মঘট পালন করেন। তপশিলি নেতা প্রেমহরি বর্মণ বলেন উত্তরবঙ্গের তপশিলি মানুষেরা পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে। ১৮ জুন মতুয়া মহাসঙ্ঘের নেতা প্রমথনাথ ঠাকুর একটি জনসভায় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন।

পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলন সর্বাত্মকভাবে সফলতা লাভে সুরাবর্দি-সহ লিগ নেতারা প্রমাদ গোনে এবং অখণ্ড বাঙ্গালিজাতির ধুয়ো তুলে সুচতুরভাবে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবকদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার কসাই সুরাবর্দি, লিগের কট্টরপন্থী ও তাত্ত্বিক নেতা আবুল হাসিম ও তরুণ নেতা ফজলুর কাদের চৌধুরী। প্রস্তাবিত অখণ্ড বাঙ্গলার ইসলামিকরণ দেখে উৎফুল্ল জিন্না স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানায়। গান্ধীজী-সহ কংগ্রেসের শীর্ষনেতারা দ্বিধা বিভক্ত। বাঙ্গলার কতিপয় কংগ্রেস নেতা স্বাধীন যুক্তবঙ্গের ফাঁদে পা দিলেন। স্বাধীন যুক্তবঙ্গের তীব্র বিরোধিতা করলেন শ্যামাপ্রসাদ। কলকাতার দাঙ্গা ও নোয়াখালির গণহত্যার উদাহরণ তুলে তিনি যুক্তি দিলেন যেহেতু স্বাধীন যুক্তবঙ্গের শাসন ক্ষমতায় লিগ নেতারাই থাকবেন সেহেতু বাঙ্গালি হিন্দুরা কোনোমতেই তাদের বিশ্বাস করবে না। উপরন্তু পরবর্তীকালে এই যুক্তবঙ্গ যে পাকিস্তানে যুক্ত হয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কী? এর মধ্যে ৩ জুন মাউন্ট ব্যাটন ভারত ভাগের প্রস্তাব দেন। ঠিক বাঙ্গলা ও পঞ্জাবে আইনসভায় ভোটাভুটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বাঙ্গলার মুসলমান বিধায়করা ১২৬-৯০ ভোটে পাকিস্তানের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। প্রত্যুত্তরে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ গঠনের বিধায়কেরা ৫৮-২১ ভোটে নিজেদের ভারতভুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ৩ জুলাই, ১৯৪৭ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন প্রফুল্লকান্তি ঘোষ। তার সঙ্গে শপথ নেন মন্ত্রীসভার প্রথম দশজন সদস্য।

১৫৯৯ সালে ইসলামি শাসনের বশ্যতা অস্বীকার করে সর্বাত্মক স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন মহারাজা প্রতাপাদিত্য। তার প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পর আরব সাম্রাজ্যবাদের বুকচিরে বাঙ্গালি হিন্দু গরিমার পুনরুত্থান ঘটল পশ্চিমবঙ্গ স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের সার্থকতা :

স্বাধীনতার পর এবং অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষে নতুন নতুন প্রদেশের জন্ম হচ্ছে। প্রতিটি প্রদেশই অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে বর্ণাঢ্যভাবে তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিকভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটলেও সত্তর বছর ধরে কেন দিনটি পালনে সরকার বাহাদুরের অনাগ্রহতা বিষয়টি ভাববার! ১৯৪৭ সালের ২০ জুন যে ৫৮-২১ ভোটে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়, তার বিরোধী ২১ জন সদস্যই মুসলমান ছিলেন। আইনসভায় তিন কমিউনিস্ট নেতা, সিপিআই-এর জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। তৃতীয় জন রদপনারায়ণ রায় ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। তার পরেও বামশাসিত পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ চার দশকে এই ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কোন রহস্যে!

যদি পশ্চিমবঙ্গের জন্ম না হতো, তাহলে এই সম্পূর্ণ ভূখণ্ডই পূর্ব পাকিস্তানে চলে যেত। সমগ্র পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্য ও সিকিমও ভারতের বাইরে চলে যেত। কারণ এই আটটি রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের একমাত্র পথ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়েই গেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম কখনই হতো না। বাঙ্গালি সংস্কৃতি অবলুপ্ত হয়ে যেত, যেভাবে পাকিস্তানে আঞ্চলিক ভাষা সংস্কৃতি বিলীন হয়ে গেছে। ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব দ্রুত বিপন্ন হতো। ■

ভুল সংসোধন

স্বস্তিকার গত ৮ জুন সংখ্যার সূচীপত্রে **ভারত-চীন সীমান্তে সাম্প্রতির উত্তেজনা ঃ প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য**-এর লেখক বিমল নন্দ ছাপা হয়েছে। হবে **বিমলশঙ্কর নন্দ**। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত। —স্ব: স:

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্য না বুঝলে ক্ষমতায় এলেও পশ্চিমবঙ্গের বিলুপ্তি রোধ করা যাবে না

মোহিত রায়

পশ্চিমবঙ্গ অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশের পশ্চিম ভাগের একটি মানচিত্র মাত্র নয়, এটি বাঙ্গালি হিন্দুর মুক্তির ভাবনা। হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক কর্মীরাও এই বিষয়টি নিয়ে ন্যূনতম অবহিত নন। তাঁদের দোষ নেই, এই বার্তা তাঁদের কাছে পৌঁছে দেবার বেশি কেউ নেই। এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিই যে, স্বস্তিকার ৬ জুলাই ২০১৫-র সংখ্যায় এই লেখকের একটি লেখা (শ্যামাপ্রসাদ না মাদ্রাসা— কোন নৌকায় পা দেবেন ঠিক করুন— মোহিত রায়) প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটির বিষয় ছিল ২০১৫-র ২৩ জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ববি হাকিমকে দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ পক্ষে ভাজপার দুই শীর্ষ নেতা হুগলিতে মাদ্রাসা খোলার জন্য সেখানে পৌঁছে গেলেন ও রাজ্যের বাকি বন্ধ মাদ্রাসা খোলার জন্য দাবি তোলেন। পশ্চিমবঙ্গ দিবস সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিরা কেবল বিশেষ ভোটের লোভে (যা কোনোদিনই পাওয়া যাবে না) সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘরগুলি খোলার জন্য উদগ্রীব হতেন না। পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুর মুক্তির ভাবনা। ১৮৭২-এর প্রথম জনগণনার পর সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো বঙ্গপ্রদেশে মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুর চেয়ে কিছু বেশি। ১৯৩১ পর্যন্ত এ পার্থক্য তেমন বেশি ছিল না। ৫৬ শতাংশ মুসলমান, ৪৪ শতাংশ হিন্দু। কিন্তু এই সুযোগেই ব্রিটিশ সরকার আনল ১৯৩৫ সালের সাম্প্রদায়িক চুক্তি বা কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড। বাঙ্গলার আইনসভায় মুসলমান আসন হলো ১৩০টি। হিন্দু আসন, তপশিলি আসন মিলিয়ে মাত্র ৯০। এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা। তাঁদের বিবৃতিতে তাঁরা খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, সংখ্যায় মুসলমানরা বেশি হলেও শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছুতেই হিন্দুরা অনেক এগিয়ে। সুতরাং বাঙ্গলার ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত কেবল জনসংখ্যার মানদণ্ডে হতে পারে না। বাঙ্গলার কংগ্রেস, বিশেষত সুভাষচন্দ্র বসু এই চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। কংগ্রেস হাইকম্যান্ড শোনেনি। সর্বভারতীয় সব দলেরই এই দিল্লি নির্ভরতা বঙ্গপ্রদেশের অনেক ক্ষতি করেছে ও আজও করছে।

পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করাই বাঙ্গালি হিন্দুর প্রাথমিক কাজ। যে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকবে, বাঙ্গালি ছাত্র বিদ্যালয়ে আরবি শিখবে, বিদ্যালয়ের অভাবে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা পড়বে মাদ্রাসায়, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে গড়া মসজিদগুলি রাজ্যের পর্যটন বিভাগের আকর্ষণ হয়ে থাকবে, ১ কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী থাকবে, ইমামরা ভাতা পাবে, কর্ণসুবর্ণ নাম মুছে গিয়ে হবে মুর্শিদাবাদ, সম্রাট শশাঙ্ক বা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোনো স্মারক থাকবে না— সেটি পশ্চিমবঙ্গ নয়।

সাড়ে পাঁচশো বছরের ইসলামি শাসন বাঙ্গলার কয়েক হাজার বছরের ধর্ম-সংস্কৃতি-ভাষাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। বাঙ্গলায় তাই নেই কোনো প্রাচীন মন্দির, বৌদ্ধ বিহার। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে হিন্দু-বৌদ্ধের বাঙ্গলাকে বানানো হয়েছে ইসলাম প্রধান বাঙ্গলা। ব্রিটিশ শাসন এই দুঃশাসন থেকে

মুক্তি দেয়। বাঙ্গালির নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় যাকে বলেছেন, 'ডিভাইন প্রভিডেন্স বা বিধির আশীর্বাদ'। এরপর বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, সরলা দেবী, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন বাঙ্গালির সভ্যতা সংস্কৃতি। ১৯৩৫-এর কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড মেনে ১৯৩৭-এর নির্বাচন থেকে শুরু হলো আবার মুসলিম লিগের ইসলামি শাসন। স্বাধীনতা ও দেশভাগের আবহাওয়ায় তপ্ত হয়ে উঠল বাঙ্গলায় ইসলামি অত্যাচার। ১৯৪৬-এর কলকাতার মহাদাঙ্গা ও নোয়াখালির হিন্দু গণহত্যার পর বাঙ্গালি হিন্দু বুঝে গেল আগামীদিনে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গলায় তাদের অবস্থা কী হবে? এগিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরব হলেন বাঙ্গলার মনীষীরা। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, শিশির মিত্র, নমঃশূদ্র নেতা প্রথমরঞ্জন ঠাকুর বললেন বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড চাই। এগিয়ে এলেন বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতারাও, ডাঃ বিধান রায়, অতুল্য ঘোষ। বাঙ্গালি হিন্দুর কয়েক হাজার বছরের ধর্ম সংস্কৃতি বাঁচাতে, হিন্দু নারীর সম্মান রক্ষার্থে, বাঙ্গালি হিন্দুর নিজের বাসস্থানের দাবিতে তৈরি হলো পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা বঙ্গপ্রদেশ ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্নে একমত হলো না। তখন হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে হলো পশ্চিমবঙ্গ আইন সভা এবং মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে হলো পূর্ববঙ্গ আইন সভা। পশ্চিমবঙ্গ আইন সভায় সংখ্যাধিক্যের ভোটে পশ্চিমবঙ্গের ভারতভুক্তি নিশ্চিত হয়। অখণ্ড বাঙ্গলার সব মুসলমান সদস্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেন, কতিপয় তপশিলি সদস্য ছাড়া সব তপশিলি সদস্য-সহ সব হিন্দু সদস্য ভারতভুক্তির পক্ষে ভোট দেন।

এই পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করাই বাঙ্গালি হিন্দুর প্রাথমিক কাজ। যে পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা চালু থাকবে, বাঙ্গালি ছাত্র বিদ্যালয়ে আরবি শিখবে, বিদ্যালয়ের অভাবে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা পড়বে মাদ্রাসায়, হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে গড়া মসজিদগুলি রাজ্যের পর্যটন বিভাগের আকর্ষণ হয়ে থাকবে, ১ কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী থাকবে, ইমামরা ভাতা পাবে, কর্ণসুবর্ণ নাম মুছে গিয়ে হবে মুর্শিদাবাদ, সম্রাট শশাঙ্ক বা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোনো স্মারক থাকবে না— সেটি পশ্চিমবঙ্গ নয়। শ্যামাপ্রসাদেরা এই পশ্চিমবঙ্গ আমাদের উপহার দিয়ে যাননি। আজ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে হবে বাংলাভাষায় কথা বললেই সে বাঙ্গালি নয়, তাকে পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারও স্বীকার করতে হবে। বাংলাভাষী ও বাঙ্গালি এক নয়।

২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন এই ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার। কেবল ক্ষমতা দখলে কিছু আসে যায় না। উত্তরাখণ্ডে ভাজপা বারবার ক্ষমতায় এসেছে কিন্তু দেবভূমি উত্তরাখণ্ড দিনে দিনে বহিরাগত মুসলমানদের আবাসভূমি হয়ে উঠেছে। এখন তীর্থ শহরগুলিতে শুনবেন আজানের গর্জন। চুল কাটা, তুলা, মাংসের ব্যবসা পুরোটাই মুসলমানদের দখলে যা কয়েক দশক আগেও ছিল না। এতদিন পরে গুরগাঁও হয়েছে গুরুগ্রাম, ইলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ। বছরের পর বছর রাজস্থানে ক্ষমতায় থেকেও আজমিরের আসল নাম অজয়মেরু হলো না। গুজরাটের রাজধানী আসলে কর্ণাবতী আজও আহমেদাবাদ রয়ে গেল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকরণে নতুন মেট্রো স্টেশনের নাম হবে তিতুমীর। অনেকবার বলে, দেখা করেও হিন্দুত্ববাদী রেলমন্ত্রী সে নাম পালটাননি।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যের পার্থক্য হলো যে, অন্য রাজ্যে সমস্যা সমাধানে কিছু দেরি হলেও চলবে, পশ্চিমবঙ্গে তা হবে না। এখানে প্রতিটি দিন আমরা পশ্চিম বাংলাদেশ হবার দিকে এগিয়ে চলেছি। গত ১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯-এ ইসলামি হিংসা দেখিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ তাদের প্রায় দখলেই এসে গেছে। ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের গুরুত্ব না বুঝলে কে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করলো তা বোধহয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে না। ▮

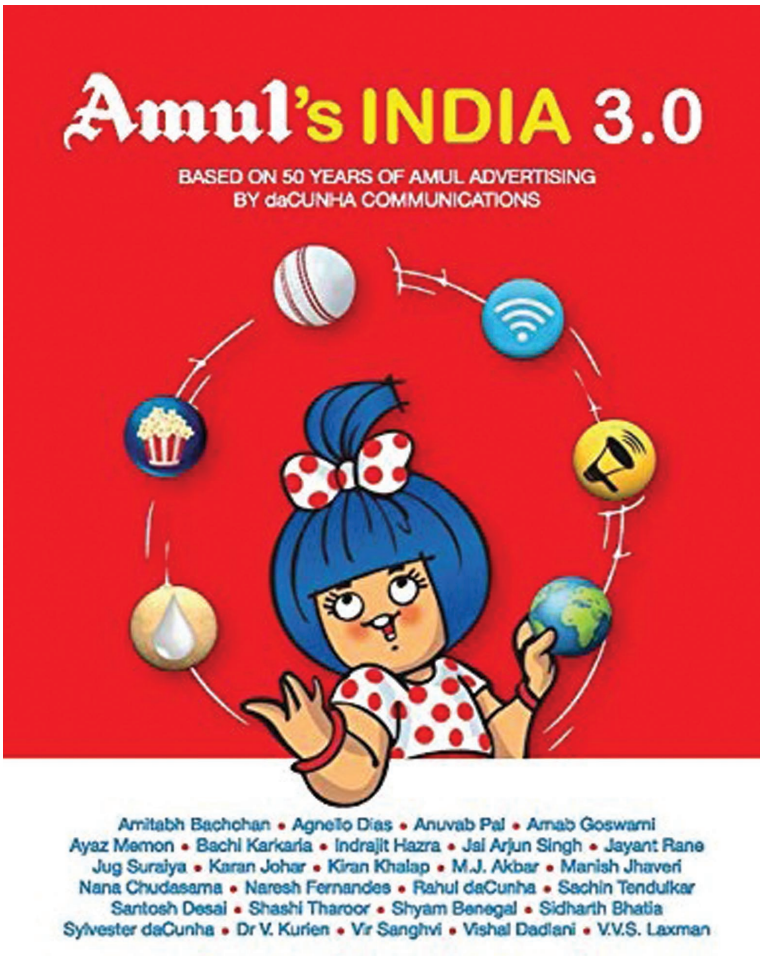

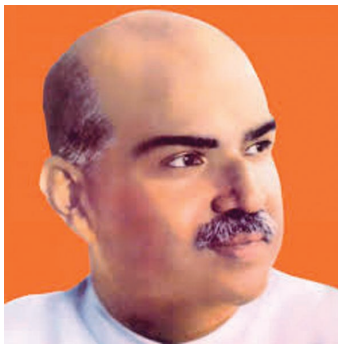

পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে !

স্মৃতিলেখা চক্রবর্ত্তী

দেশভাগের পর সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত জাতি বোধ হয় সিন্ধিরা। বাঙ্গলা বা পাঞ্জাবের মত সিন্ধুদেশ ভাগ না হওয়ায়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ ভাগ হয়ে থাকতে বাধ্য হন তাঁরা। গুজরাটের জুনাগড়, মহারাষ্ট্রে উলহাসনগর, অন্ধ্রের সেকেন্দ্রাবাদের মতো নানা জায়গায় গড়ে উঠে সিন্ধি কলোনি। এই কলোনিগুলো বাণিজ্যের আঁতুড়ঘর। একের পর এক ব্যবসায়ী প্রতিভা উঠে এসেছে এসব কলোনি থেকে। সিনেমা, ভারী শিল্প, ওষুধ, সফটওয়ার ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য গড়ে তুলেছে। ভারতের প্রতিটি বড়ো শহরে সিন্ধিরা গড়ে তুলেছেন নিজস্ব স্কুল ও কলেজ। যাতে সিন্ধি বাবা-মায়েদের কোনো অসুবিধা না হয় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে। এই দেশের সব থেকে শিল্পোদ্যোগী জাতি এরাই। হিন্দুজা থেকে রহেজা, হিরনন্দনি থেকে ওয়াধওয়ানি; ভারতীয় বিলিওনেয়ারদের বেশিরভাগই সিন্ধি। বিলিওনেয়ার, অর্থাৎ একশো কোটি টাকার ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য।

এত সাফল্য, এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সিন্ধিরা হারিয়েছেন অনেক কিছু। মোহনদাস গান্ধীর কথায় বিশ্বাস করে সিন্ধুর মাটি ভাগ বাটোয়ারা করেননি তাঁরা। এই ঐতিহাসিক ভুলের পরিণাম সিন্ধিরা বুঝতে পারেননি। ভারতবর্ষে এলেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের সকলকে এক রাজ্যে থাকতে দেওয়া হলো না, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিতরণ করে দেওয়া হলো। যাতে একটা রাজ্যের ওপর বেশি চাপ না পড়ে। ফলে জনসংখ্যা দিয়ে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা চিরকালের মতো হারালেন তাঁরা। একজন সিন্ধি যতই ক্ষমতাবান হোন, কোনোদিন কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না। রাজ্যস্তরে নেতা, মন্ত্রীও না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রাজ্যে খণ্ড খণ্ড ভাবে থাকার ফলে একটি সিন্ধি সিনেমা শিল্পও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। টাকার কোনো অভাব নেই তাঁদের। কিন্তু সিন্ধি সিনেমা তৈরি হয় ৫ বছরে একটা। গুণমানে সেসব সিনেমা হয়তো ভোজপুরীর থেকেও নীচুস্তরের। ভালো সিনেমা করেই বা লাভ কী? এ রাজ্যে, সে রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা সিন্ধিদের মধ্যে সেই সিনেমা প্রচার করবে কে? এসব সিনেমা কোন সিনেমাহল চালাবে? হিন্দি সিনেমায় আসরানি, রাজকুমার হিরানি, আফতব শিবদাসনি, রণবীর সিংহ (ভাবনানি)-র মতো কিছু সিন্ধি থাকবেন। কিন্তু হাজার পয়সা ফেললেও এমন কোনো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে না, যেখানে কেবল সিন্ধিরাই ছড়ি ঘোরাতে পাবেন।

বাঙ্গালি আর সিন্ধিদের মধ্যে একটা বড়ো মিল হলো, সিন্ধিরাও মিষ্টি খেতে যথেষ্ট ভালোবাসেন। উলহাসনগরের আনাচে কানাচে মিষ্টির দোকানের সংখ্যা অনেক। এ ওয়ান সুইটস উলহাসনগরের সব থেকে বড়ো মিষ্টির দোকান। প্রায় সমস্ত বিখ্যাত সিন্ধি মিষ্টিই এখানে পাওয়া যায়। ঘিয়ার, লাডওয়া লাড্ডু, সিঙ্গার মিঠাই, মালপুরা, সাতপুরা, লোলা আর মোহন থাল। মোহন থাল নামটা পড়ে অনেকেই অবাক হবেন। কারণ এটা গুজরাটি মিষ্টি বলেই পরিচিত। অথচ উলহাসনগরের সিন্ধিদের কাছে এটা সিন্ধুর মিষ্টি। বাকি মিষ্টিগুলো দেখতে চেনা লাগলেও একটু অন্য রকম। মালপুরা হলো ওপরে সুজির হালুয়া বা রাবড়ি লাগানো মালপুয়া। ঘিয়ার-টা দেখতে আড়াই প্যাঁচের জিলিপির মতো। তারও উপরে ছড়ানো আছে খোয়াক্ষীর। লাডওয়া লাড্ডু হলো আটার লাড্ডু, অথচ খালি চোখে বেসন লাড্ডুর সঙ্গে খুব একটা তফাত টের পাওয়া যায় না। এই দোকানে বাঙ্গালি মিষ্টি এবং উত্তর ভারতীয় মিষ্টিও পাওয়া যায়। সেগুলো অন্যান্য শহরে এমনকী বিদেশেও বিক্রি হয়। যায় না কেবল সিন্ধি মিষ্টি। কারণ উলহাসনগরের বাইরে এসব কে চিনবে আর কেই বা কিনবে? সিন্ধিদের যদি একটা নিজস্ব রাজ্য থাকত তাহলে হয়তো সেই রাজ্য সরকার এই বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারত। রাজ্য সরকারি উদ্যোগে এসব মিষ্টির জন্য GI (Geographical Indication) আদায় করতে পারত। GI হলো একটা ভৌগোলিক মার্কা যে এই রাজ্যের বা এই অঞ্চলের এই পণ্যটি খুব বিখ্যাত। এটা পেলে বিদেশে নিজের পণ্য বিক্রি করতে খুব সুবিধা হয়। মোহনথালের কথা চিন্তা করলেও একটা অদ্ভুত সম্ভাবনা মাথায় আসে। মোহনথাল যদি সত্যি সত্যিই সিন্ধি মিষ্টিও হয়, তাহলেও কিছু করার নেই। গুজরাটিদের কাছে একটা আস্ত রাজ্য আছে। মোহনথালের যদি কখনো GI হয়, তাহলে সেটা গুজরাটই নেবে। শুধু জুলজুল করে চেয়ে দেখা ছাড়া সিন্ধিদের আর কোনো রাস্তা নেই।

সিন্ধিদের নিশ্চয়ই আরও অনেক রকম শিল্পকলা ছিল। বিশেষ রকম গয়না, কাপড়, রং, চিত্রকলা। যেমন, বাঙ্গলার আছে নিজস্ব তাঁত, দেব দেউল, টেরাকোটা, পটচিত্র। স্রেফ একটা ভুল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, তাতেই সিন্ধি সভ্যতা সংস্কৃতির সব শেষ। বাঙ্গলার শিল্পীরা

তবু রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করতে পারেন। ছৌ অ্যাকাডেমি হয়েছে, অনেক বাঙ্গালি কুটিরশিল্পী মাসোহারা পাচ্ছেন। বাঁকুড়ার মেচা প্রস্তুতকারকরা, মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি শিল্পীরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করতে পারেন এসব পণ্যের GI এনে দেবার। যারা প্রায়ই বলেন—"অমুক রাজ্য বাঙ্গালির সব কিছু চুরি করে নিল"; তারা কি আন্দাজ করতে পারেন, যে জাতির কাছে কোনো রাজ্যই নেই, তাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক সম্পদ কীভাবে অন্যান্য রাজ্যের দ্বারা লুট হতে পারে বা চর্চার অভাবে বিলুপ্ত হতে পারে?

সিন্ধিরা এক কথায় গোটা সিন্ধের দাবি ছেড়ে এসে শুধু ভাষা-সংস্কৃতিই হারাননি। হারিয়েছেন নিজেদের ইতিহাসের প্রতি অধিকার। করাচী, হায়দরাবাদ (পাকিস্তান) ইত্যাদি শহরগুলোতে রীতিমত সিন্ধি রাজত্ব চলত। সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী ছিল করাচী। সেই স্মৃতি বহন করে এখনো সিন্ধিরা নিজেদের বহু প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন করাচী দিয়ে। উলহাসনগরে গেলে বহু করাচী হিন্দু হোটেল, করাচী রেস্টুরেন্ট, করাচী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়। সেরকমই ভারত বিখ্যাত একটা নাম হল করাচী বেকারি। ভারতের হায়দরাবাদে উদ্বাস্তু হয়ে আসা খানচাঁদ রমনানি প্রতিষ্ঠিত কেক বিস্কুটের দোকান। গত বছর যখন পাকিস্তান পুলওয়ামায় ভারতীয় সেনার ওপর হামলা চালায়; আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরুর মতো শহরে করাচী বেকারির দোকানগুলোয় ভাঙচুর চালানো হয়। ঢেকে দেওয়া হয় দোকানের বাইরে করাচী বেকারি লেখা 'করাচী' অংশটা। করাচী যে কখনো হিন্দুদের শহর ছিল এবং সিন্ধিরা সেই স্মৃতিটুকু ধরে রাখতে চেয়েছিল; এক বিরাট ভুল বোঝাবুঝি এসে সেই সমস্ত কিছু ধামাচাপা দিয়ে দিল।

সিন্ধিদের ভাষা হারানো শুরু বহু আগে। শুরুটা হয় লিপি দিয়ে। সিন্ধি লিপি প্রাচীনকালে লেখা হতো হাতবাঁকি লিপিতে। পরে জনসংখ্যা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী লিপির জায়গা নেয় আরবি লিপি। স্কুল কলেজ ও অন্যান্য সরকারি কাজে সিন্ধি ভাষা আরবি লিপিতে লেখা শুরু হওয়ায় সিন্ধুর হিন্দুরাও ধীরে ধীরে ওই লিপি ব্যবহার করতে

ভারতের জাতীয় সংগীতের পঙ্‌ক্তিতে পঞ্জাব, সিন্ধু আর গুজরাট পাশাপাশি আছে; কিন্তু সিন্ধুদেশের এতটুকুও আর ভারতভূমির মধ্যে নেই। দেশভাগ সিন্ধিদের জন্য অভিশাপ আর বাঙ্গালিদের কাছে শাপে বর। মাটিহারা হবার থেকে বোধ হয় মাটি ভাগ ভালো।

বাধ্য হন। আর দেশভাগের পর তো সিন্ধিভাষার চর্চাই কমে গেছে। সিন্ধুদেশ কেমন ছিল, তার মাটির রং কেমন, সেখানকার প্রকৃতি কেমন, এসব কিছুই আজকের সিন্ধিদের মনে নেই। ওই উদ্বাস্তু কলোনিটুকুই তাদের কাছে সিন্ধ। সেজন্য উলহাসনগরের নাম পাল্টে 'সিন্ধু নগর' করার চেষ্টা করেছিলেন সিন্ধিরা। সঙ্গে সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ে শিবসেনা। উলহাসনগর মহারাষ্ট্রের অংশ। মারাঠীরা দয়া করে থাকতে দিয়েছে, ব্যবসা করতে দিয়েছে; তাই বলে উলহাসনগরকে সিন্ধিদের নামে দানছত্র লিখে দেয়নি। নিজের মাটি যারা ছেড়ে এসেছে, অন্যের মাটিতে তাদের ভিখারির মতোই থাকতে হবে। আর ভিখারির কাছে যতই পয়সা থুকক, সে চিরকাল ভিখারিই থাকে।

নিজে উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান হওয়ায় বহু উদ্বাস্তু অঞ্চলে ঘুরতে গেছি। উলহাসনগরও ঘুরে দেখেছি। নতুন সিন্ধি প্রজন্মের সঙ্গে কথা বলেছি। ঘুরতে ঘুরতে অদ্ভুত একটা উপলব্ধি হয়েছিল। ওরা জানেও না, ওরা কী হারিয়েছে। আমরা জানিও না, আমরা কী পেয়েছি। এমনিতে সিন্ধিদের সাথে বাঙ্গালিদের কোনো তুলনাই হয় না। ওদের নাম, যশ, অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির কাছে আমরা কিছুই না। কিন্তু আমাদের একজন শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন। লোকটা সম্ভবত জ্যোতিষী ছিলেন, বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। অনেক লড়াই, অনেক ঝগড়া করে লোকটা একটা রাজ্য রেখে গেছেন আমাদের জন্য। ওই রাজ্যটা আছে বলেই আমরা এখানো ছড়ি ঘোরাই। পশ্চিমবঙ্গে আমরাই মন্ত্রী, আমরাই ভোটার। সাংসদ সংখ্যার জোরে রাজনৈতিক দলগুলোকে চোখ রাঙাই। বাঙ্গলার প্রাপ্য না দিলে, বাঙ্গালিদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী না করলে ভোটে হারিয়ে দেব বলে ধমকাই। এক টুকরো মাটি আছে বলে সেখানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি করতে পারি। এখানে আমরাই নয়াক, আমরাই নায়িকা, আমরাই গায়ক, আমরাই গায়িকা।

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আমরা লবির কথা বলি। মুম্বাই লবি, দক্ষিণী লবি বাঙ্গালি ক্রিকেটারদের সুযোগ পেতে দিচ্ছে না। তবে ক্রিকেটটা বাদ দিলে রাজ্য থেকে অন্যান্য খেলায় বাঙ্গালি খেলোয়াড়রা সুযোগ পান। সাঁতার, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলায় বাঙ্গালিরা যতই খারাপ হোক না কেন, জাতীয় ক্রীড়ায় অন্তত রাজ্যের প্রতিনিধিত্বটুকু করতে পারেন। কিন্তু সিন্ধিরা এই সুযোগটাও কখনো পাবে না। সাধারণ প্রতিভা না হলে কেনো সিন্ধি খেলোয়াড়ের সেই রাজ্যের হয়ে খেলা মুশকিল আছে। ফুটবল যে বাঙ্গালির প্রাণ, রাজ্যটা না থাকলে কোথায় হতো এই ক্লাব সংস্কৃতি? অন্য রাজ্যে গিয়ে বাঙ্গালি থাকতেই পারে। তবে সেই রাজ্যের লোক বাঙ্গালিকে তার সংস্কৃতি নির্বিঘ্নে পালন করতে দেবে না অসহিষ্ণু হয়ে অসহযোগিতা করবে, এটা বাঙ্গালির নিয়ন্ত্রণে নেই।

চাকরি-ব্যবসার ক্ষেত্রে এখন ভারতের বহু রাজ্যই ভূমিপুত্র সংরক্ষণের কথা ভাবছে। সেক্ষেত্রে সিন্ধি এবং কাশ্মীরি পণ্ডিতরা, যাদের হাতে কোনো রাজ্যই নেই, তারা কী করবে? এরা তো কোনো রাজ্যেরই ভূমিপুত্র নয়। তাই বলে আমি রাজ্যগুলোকে দোষ দিই না। মানুষ নিজের কর্মের বোঝা বয়। জাতিকেও নিজের অতীত মূর্খামির দায়িত্ব নিতেই হয়। সিন্ধি ও

কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিজের রাজ্য ধরে রাখতে পারেননি, এই দায় একান্তই তাঁদের। যদি কোনো জাতি ধনগর্বে অন্ধ হয়ে ভেবে নেয়, যে তাদের নিজস্ব ভূমির দরকার নেই। কেবল টাকার জোরেই তারা বেঁচে থাকবে, তাহলে তাদের সঙ্গে ঠিক সেটাই হচ্ছে, যেটা তাদের প্রাপ্য। সিন্ধিদের মতো সারা দেশে বাঙ্গালিরাও ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি, ভগবান না করুন, যদি কখনো এমন দিন আসে সারা ভারত থেকে বাঙ্গালিদের খেদিয়ে দেওয়াও হয়, তাহলেও আমাদের যাবার মতো একটা জায়গা আছে। অসমের বাঙ্গাল খেদা বা মণিপুর, মিজোরাম থেকে তাড়া খাওয়া বাঙ্গালিরা জানত, পশ্চিমবঙ্গ নামে একটা রাজ্য আছে। সেটা বাঙ্গালিদের। সেই রাজ্য তার কথা শুনবে, তাকে আশ্রয় দেবে। এই রাজ্যটা আছে তাই দর্পভরে কোনো এক পক্ষ বলতে পারে---''অন্য রাজ্য থেকে বাঙ্গালিদের তাড়ানো হলে, পশ্চিমবঙ্গ থেকেও তার পালটা দেওয়া হবে।'' আর সিন্ধিরা? তঁরা তো উলহাসনগরেরও নাম পালটে সিন্ধুনগর করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে বাঙ্গালির যে কী হতো! ভাগ্যিস, আমাদের একটা পশ্চিমবঙ্গ আছে।

পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটা মাথার ওপর ছাদের মতো। ওটা আছে তাই, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান, রবীন্দ্র-বঙ্কিম-শরৎ করতে পারি। প্রবাসী বাঙ্গালিরা এখান থেকে ছেলের বউ বা জামাই খুঁজে এনে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম নিজেদের বাঙ্গালিত্ব বজায় রাখতে পারেন। প্রবাসে বাঙ্গালি সংস্কৃতি ঝালাই করে নিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের সাহায্য নিতে পারেন। এত কিছু পেয়েও যেসব বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গকে দূর ছাই করেন, তাদের উচিত সিন্ধি ও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের অবস্থাটা একবার চাক্ষুষ করা। আমাদের রাজ্যটা ভালো হোক, খারাপ হোক, সেটা আমাদের। কোনো রাজ্যই নিখুঁত হয় না, তার খুঁতগুলো দূর করার দায় ভূমিপুত্রদেরই। পশ্চিমবঙ্গ থাকতে থাকতে বাঙ্গালির নিজ রাজ্যের মর্যাদা বুঝলে ভালো। সাতচল্লিশে একজন শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন, হিন্দু বাঙ্গালিকে নিজের বাসভূমি এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু আর কোনো শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের বাঁচাতে আসবেন না।

এই বিষয়ে একটা ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। হাইওয়ের ধারে একটি ধাবায় খেতে গিয়েছিলাম। নাম—সিন্ধ্-পাঞ্জাব ধাবা। দোকানটা যিনি চালান, ভদ্রলোক বয়স্ক। তবে বেশ সৌম্যদর্শন, খুশি খুশি চেহারা। তাঁরই আগ্রহে প্রথঢ় সিন্ধুদেশের খাবার চেখে দেখেছিলাম। ডাল পাকোয়ান, সাই ভাজি আর সিন্ধি কিমা। অপূর্ব রান্না। খাওয়া শেষে ভদ্রলোকের সঙ্গে সামান্য আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল। কথায় কথায় জানতে পেরেছিলাম, উনি সিন্ধি এবং ওনার পরিবারে কেউ পাঞ্জাবি নেই। জিজ্ঞেস করলাম—''তাহলে 'সিন্ধ্-পাঞ্জাব ধাবা' নাম রেখেছেন যে''!

'সিন্ধের নামে চলে না তো। সিন্ধ্কে আর কে চেনে?' কঠোর হয়ে এল বৃদ্ধের গলা।

কী উত্তর দেব, বুঝতে পারলাম না। বৃদ্ধ বলে চললেন, 'একদিন, সিন্ধের পাশে বলে পাঞ্জাবকে চিনত। পহলে সিন্ধ, ফির পঞ্জাব।' ভদ্রলোকের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার নিভে গেল। 'আর আজ? আর আজ সিন্ধ্ হিন্দ্ কে বাহার হো গয়া!'

কথাগুলো হঠাৎ করে ফিরিয়ে আনল সাতচল্লিশের স্মৃতি। বিল মিটিয়ে চলে এলাম। এই অভিমানের কোনো উত্তর সত্যিই আমার জানা নেই। ওনার বলা লাইনটা বহুদিন কানে বাজত—'' আজ সিন্ধ হিন্দকে বাহার হো গ্যায়া''! ভারতের জাতীয় সংগীতের পঙ্ক্তিতে পঞ্জাব, সিন্ধু আর গুজরাট পাশাপাশি আছে; কিন্তু সিন্ধুদেশের এতটুকুও আর ভারতভূমির মধ্যে নেই। দেশভাগ সিন্ধিদের জন্য অভিশাপ আর বাঙ্গালিদের কাছে শাপে বর। মাটিহারা হবার থেকে বোধ হয় মাটি ভাগ ভালো। ■

করোনাকালে ‘বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা’র উপলব্ধি করেছে ভারতবাসী

ড. মনমোহন বৈদ্য

ভারত-সহ সমগ্র বিশ্ব করোনা ভাইরাসের প্রকোপে উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিশাল জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই যুদ্ধ বিশ্বের অন্য উন্নত ও শক্তিশালী দেশগুলির থেকে তুলনামূলকভাবে আমাদের অবস্থা অনেক সন্তোষজনক। এই প্রথম দেশবাসী লকডাউনের সম্মুখীন হয়েছে। এর সপক্ষে ও বিপরীত পরিণামের আলোচনাও সর্বত্র হয়ে চলেছে। ক্রমশ লকডাউন শিথিল করা হচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই প্রকার নতুন ধরনের রোগের জন্য উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলাও নতুন ধরনের হবে এবং এরপরে বিশ্বও আগের মতো পরিস্থিতিতে বহাল থাকবে না। জনজীবনকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনা সহজ হয়ে উঠবে না। সংকল্পবদ্ধ হয়ে নতুন পথে একসঙ্গে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারত বিশ্বের অন্য দেশগুলির তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা এবং যথেষ্ট বিশেষতাও রাখে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে শাসনক্ষমতাই সর্বোপরি। সমাজের সমস্ত ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত। এই জন্য এদের কল্যাণকারী রাষ্ট্রে (ওয়েলফেয়ার স্টেট) আখ্যায়িত করা হয়। এই রকম বিপত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রশাসন দ্রুততার সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জনসাধারণও শাসনব্যবস্থার সক্রিয়তার জন্য অপেক্ষারত থাকে। কিন্তু ভারতীয় পরিস্থিতি এর থেকে আলাদা। ভারতীয় পপরম্পরায় সমাজের এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে। টানা-পোড়েন আছে, ভারতীয় সমাজের কিছু নিজস্বতাও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে স্পষ্টতই বলেছেন যে, ওয়েলফেয়ার স্টেট ভারতের পরম্পরা কখনই নয়। ভারতে পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই শুধু রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকে, অবশিষ্ট সমস্ত বিষয়গুলির ভাবনাচিন্তা রাষ্ট্রনিরপেক্ষভাবে সমাজ দায়িত্ব পালন করে চলেছে। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যে সমাজ নিজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য রাষ্ট্রের উপর ন্যূনতমভাবে নির্ভরশীল সেই সমাজকে ‘স্বদেশী’ সমাজ বলা হয়। আচার্য বিনোবাভাবেও বলেছেন যে, ‘‘যতদিন আমরা পরাধীন ছিলাম ততদিন রাষ্ট্রশক্তির গুরুত্ব ছিল, এখন আমরা স্বাধীন, সুতরাং এখন জনশক্তিকে জাগানো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।’’ তিনি আরও বলেছেন, ‘‘যে

সমাজ নিজ প্রয়োজনের জন্য রাষ্ট্রের উপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে থাকে সেই সমাজ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, শক্তিহীনও হয়ে থাকে। বেসরকারি বিষয়গুলি বেশি করে সরকারি হয়ে যেতে থাকে।"

প্রথমে 'আমরা' ইংরেজদের গোলাম ছিলাম। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে 'আমরা' স্বাধীন হলাম। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সাল থেকে আমরা নিজেদের তৈরি করা সংবিধানের প্রচলন করেছি। স্বাধীন হওয়া সংবিধানে স্বাধীনতার আগে থেকে এই 'আমরা'র নিরবচ্ছিন্নতা আমাদের প্রকৃত পরিচয়। এখানে আক্রমণ হয়েছে, রাজারা পরাজিত হয়েছেন, বিদেশি শাসন ছিল, কিন্তু এই 'আমরা' কখনও পরাজিত হয়নি।

এই 'আমরা' হলো আমাদের এই সমাজ অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্র। এটি পাশ্চাত্যের 'ন্যাশনাল স্টেট' ধারণা থেকে আলাদা, সেটা বুঝতে হবে। পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ড. প্রণব মুখার্জি যখন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের আমন্ত্রণে নাগপুরে গিয়েছিলেন তখন তাঁর বক্তব্যেও একই সুর শোনা গিয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'পাশ্চাত্যের রাজ্যভিত্তিক রাষ্ট্রের কল্পনা এবং ভারতীয় জীবনশৈলীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় রাষ্ট্রভাবনা ভিন্ন।' এই জন্যই ভারতে কোনো প্রকার মনুষ্যসৃষ্ট অথবা প্রাকৃতিক বিপত্তিতে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজে সক্রিয় হতে দেখা যায়।

করোনা ভাইরাসের এই অভূতপূর্ব সংকটের সময় সরকারি প্রতিনিধি, সুরক্ষাকর্মী, ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী সবাই প্রাণপণে নিজেদের কর্তব্য কর্ম করে যাচ্ছেন। এই কাজগুলো করার সময় সংক্রমণশীল ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও নিষ্ঠাসহকারে সবাই কাজ করে যাচ্ছেন। কিছুলোক সংক্রমিতও হয়েছে, কিছু জনের মৃত্যুও হয়েছে। এই জন্যই এদের 'করোনা যোদ্ধা' নামে আখ্যায়িত করা সার্থক হয়েছে। সমাজের সমস্ত বর্গের মানুষ, বিশেষত সেনা ও পুলিশ এদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং এরা তার যোগ্যও। কেউ বলতে পারেন যে এরা তাদের সরকারি কাজের দায়িত্ব পালন করছেন মাত্র, সবাই করেও থাকে। কিন্তু যে রকম মনোযোগ, নিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণের ভাবনা নিয়ে এরা তা করছেন এবং এখনও করে চলেছেন সেটা লক্ষণীয় এবং এই জন্য সম্মানেরও অধিকারী।

এই সরকারি ও আধাসরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এক বড়ো অংশ নিজেদের প্রাণসংশয় করেও দেশেজুড়ে সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সক্রিয় রয়েছে। এসব করতে তাদের দায়িত্বও দেওয়া হয়নি, এর বদলে এরা কিছু পাওয়ার আশাও করেন না। তবুও 'নিজ সমাজের সংকটের সময় সাহায্য করা আমার কর্তব্য' এই দায়িত্ববোধে, আত্মীয়তা বোধের ভাবনায় তাড়িত হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এটিই 'বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা'র ভাবনা। বন্যা, ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপত্তিকালে ত্রাণকাজ, আর এই সংক্রমণশীল মহামারীর সময় নিজে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও যুক্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই আছে। সমাজের এই সক্রিয় যোগদান সমস্ত দেশজুড়ে সমানভাবে রয়েছে। এটাই জাগ্রত ও সক্রিয় রাষ্ট্রশক্তির পরিচায়ক।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ৮ লক্ষ ৮০ হাজার স্বয়ংসেবক অরুণাচল প্রদেশ থেকে শুরু করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ৮৫৭০১টি স্থানে সেবা ভারতীর মাধ্যমে ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫৫ হাজার পরিবারকে রেশনের কিট সরবরাহ করেছেন। ৭ কোটি ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার খাবারের প্যাকেট অভাবী লোকেদের বিতরণ করেছেন। প্রায় ৬৩ লক্ষ মাস্ক বিতরণ করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়া অন্য রাজ্যের ১৩ লক্ষ মানুষকে সহায়তা করেছেন। ৪০ হাজার ইউনিটস্ রক্তদান করা হয়েছে। ১৩৪১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রবাসী শ্রমিককে খাবার এবং ১ লক্ষ শ্রমিককে ওষুধ ও অন্য চিকিৎসা সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। যাযাবর জনজাতি, কিন্নর, দেহ ব্যবসায় যুক্ত, তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের ওপর নির্ভরশীল পশুপক্ষী, গোরু, বাঁদর প্রভৃতি প্রাণীকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করা করা হয়েছে। পড়াশুনার জন্য বড়ো শহরে এসে আটকে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তা করা হচ্ছে। বিশেষত উত্তরপূর্বাঞ্চলের ছাত্রদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন তৈরি করে তাদের সাহায্য করা হয়েছে এবং এদের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দির ইত্যাদির মতো ধর্মীয় স্থানে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবনযাপন করে যারা, তাদেরও এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। অনেক জায়গায় সংক্রামিত বস্তিতে গিয়ে স্বয়ংসেবকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যে কোনো দলের সরকারই হোক, সমস্ত রাজ্যেই যেখানে প্রশাসন সাহায্য প্রার্থনা করেছে স্বয়ংসেবকরা তা পূরণ করেছেন। ভিড় সামলানো, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা এইসব অসংখ্য কাজ প্রশাসনের আহ্বানে বিভিন্ন স্থানে স্বয়ংসেবকরা করেছেন। পুনায় প্রশাসনের আহ্বানে স্বয়ংসেবকরা অন্য সেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে একসঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের (রেড জোন) বস্তিতে গিয়ে ১ লক্ষ লোকের স্ক্রিনিং করেছেন এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

শুধু সঙ্ঘই নয়, অনেক সামাজিক, ধর্মীয় সংস্থা, মঠ, মন্দির, গুরুদ্বারা সবাই বিভিন্ন জায়গায় এই সামাজিক কাজে নিজেরা অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রকার সরকারি ব্যবস্থা ছাড়াও সমাজের নিজস্ব ব্যবস্থাও রয়েছে। এ সবই 'বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা' ভাবনার জাগরণের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এই প্রকার জনজাগরণের জন্যই বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকেরা, বিভিন্ন জনজাতি নামে পরিচিত গোষ্ঠী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের উপাসকরা সারা ভারতে বসবাসকারী এই সমাজ অর্থাৎ 'আমরা' এক; প্রাচীনকাল থেকেই একই আছি – এই ভাব জনজাগরণের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। আমি এই বিরাট 'আমরা'র এক অঙ্গীভূত ঘটক, এই চিন্তনই নিজেকে এই সংকটের মধ্যে ফেলেও, কোনোপ্রকার সম্মান বা প্রাপ্তির আশা ব্যতিরিকেই সমাজের জন্য সক্রিয় হতে প্রেরণা পাচ্ছে। যে কোনো জাতি, ভারতের যে কোনো রাজ্যে বসবাসকারী শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী,

দরিদ্র, গ্রাম অথবা বনাঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত সমাজ আমার নিজের – এই ভাবনার জাগরণ করাই হলো 'রাষ্ট্র' জাগরণ করা। আমি আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব, পরিবার, প্রতিবেশী, গ্রাম, জনপদ, রাজ্য, দেশ, সমগ্র বিশ্ব এবং সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড এই সমস্তই আমার চেতনায় ক্রমশ বিস্তার ও বিকশিত করার মাধ্যম। এর মধ্যে সংঘর্ষ নেই। এরা পরস্পরের পরিপূরক। এর মধ্যে সমন্বয় সাধনে আমার সক্রিয়তা দরকার। এটাই ভারতের সনাতন অধ্যাত্ম-নির্ভর একাত্মতা এবং সর্বাঙ্গীণ ভাবনা। এই বোধই ভারতকে বিশ্বে হাজার বছর ধরে বিশেষ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই জন্যই 'আমরা' সবাই এর পৃথক পৃথক এককের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্পর্কের পরিধিকে বিস্তারিত করে চলেছি। এই আপনত্ব বোধই এই প্রকার সংকটময় মুহূর্তের সময় স্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হতে প্রেরণা দিয়েছে। এই জন্যই যে কারণে সমাজে ওঠাপড়া এসে-যায়, তাতেই সমাজ গড়া হয়ে থাকে।

এই সমাজ গড়ার কাজ তাৎকালিক হয় না, আবার নিজে নিজেই হয় না। সচেতন ও দীর্ঘকাল ধরে ক্রমাগত ও সহজ প্রয়াসের পরিণাম স্বরূপ এই সমাজ গড়ার কাজ সম্পন্ন হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম লেগে যায় তবে তা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকেই ধরুন, যার গঠন এই সম্পূর্ণ সমাজে একত্মতার ভাব সৃষ্টি করে তাকে একসূত্রে বাঁধার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আজ যে সঙ্ঘের কার্যপরিধির ব্যাপকতা, প্রভাব এবং সংগঠিত শক্তির অনুভব সকলে অনুধাবন করতে পারছে তা করে তুলতে সঙ্ঘের পাঁচ প্রজন্ম লেগে গেছে। হাজার হাজার কাজের মধ্যে একটি কাজই 'মিশন' হিসেবে নিয়ে লোকে সারাজীবন অতিবাহিত করেছে। অনেক যুবকের জীবন কর্পূর হয়ে গেছে তবেই এই ফলাফল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুধু সঙ্ঘই নয়, অসংখ্য সামাজিক, ধর্মীয় সংস্থা, শিক্ষক, ব্যবসায়ী অথবা বিভিন্ন ব্যবসায় যুক্ত নাগরিক, বিশেষত অসংখ্য গৃহিণীও এই 'রাষ্ট্রজাগরণে' অনেক মৌলিক যোগদান সবসময়ই করে চলেছেন। সঙ্ঘের জন্যই এর দেশব্যাপী সংগঠিত শক্তির চিত্র

আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত এই সম্পূর্ণ সমাজ আমার সমাজ। আমাকেই একে গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে আগত সমস্ত প্রকার সংকটের মোকাবিলা করার সামর্থ্য, একাত্মতার মধ্যে নিহিত, 'আমারা' ধারণার মধ্যেই রয়েছে। আমাদের সবাইকে, সবসময়, সব পরিস্থিতিতে এই 'আমরা' ধারণাকে বাড়াতে এবং দৃঢ় করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

দৃষ্টিগোচর হয় শুধু এইটুকুই পার্থক্য।

সম্পূর্ণ সমাজের স্বার্থে অসীম আত্মীয়তা এবং বিশেষ ব্যবস্থায় অনুশাসনের সঙ্গে কাজ করার প্রবণতা গড়ে তুলতে বহু বছরের সাধনার প্রয়োজন হয়, তবেই তার কার্যসিদ্ধি ঘটে। এই প্রকারের এক উপলব্ধি ২০০৯ সালের ২৫ মে পশ্চিমবঙ্গের আয়লা ঝড়ের সময় হয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। আমি ৩ জুন ত্রাণকার্য পরিদর্শনে ওখানে গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা জিপে যাওয়ার পর আরও চল্লিশ মিনিট নৌকা করে আমরা সেই দ্বীপে পৌঁছাই যেখানে ত্রাণকার্য চলছিল। হাঁটুসমান কাদার মধ্যে দিয়ে সেখানে পৌঁছে কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বহু অনুভূতি ও সেবা কার্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার সময় আমি জানতে চেয়েছিলাম যে আর অন্য কোন কোন সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্থা এখানে ত্রাণকার্য করতে এসেছে? উত্তর হতাশাজনকই ছিল। তাঁরা জানালেন যে, পাকা সড়কের আশেপাশে তাদের ত্রাণকার্য চলেছে, এখানে ভেতরে শুধু সঙ্ঘই কাজ করেছে। আমি বুঝতে পারলাম যে, স্বয়ংসেবকদের এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন এই প্রথমবার করতে হচ্ছে। এত ভেতরে ঢুকে ত্রাণকার্য করার ব্যাপক যোজনার অভিজ্ঞতা নেই, তা সত্ত্বেও যেখানে প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন সেখানে এত ভালো কাজ অনেক অসুবিধার মধ্যেও স্বয়ংসেবকরা করছেন। এ সবই সীমাহীন আত্মীয়তাবোধ এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনায় কাজ করার অভ্যাসের ফলেই সম্ভব।

করোনা মহাসংকটকালেও এই প্রসঙ্গ এসে পড়ে। দিল্লির আনন্দবিহার স্টেশনের কাছে কোনো অপপ্রচারের কারণবশত হাজার হাজার শ্রমিক নিজের গ্রামে ফেরার উদ্দেশ্যে হঠাৎ জমা হয়ে গেল। দিল্লির স্বয়ংসেবকরা এই খবর পাওয়ামাত্র খাবার ও পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। উত্তরপ্রদেশের স্বয়ংসেবকরা সেখানের রাজ্যপ্রশাসনের সহায়তায় শ্রমিকদের তাদের গ্রামে সুরক্ষিতভাবে পাঠানোর জন্য ৫০০০ বাসের ব্যবস্থা করেছেন। বাস্তবে এটা সরকারের দায়িত্ব ছিল, তবুও স্বয়ংসেবকরা নিজের সামর্থ্য এবং ব্যবস্থা কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নিজ গ্রামমুখী হতে বাধ্য এবং আতান্তরে পড়া শ্রমিকদের গ্রামে পৌঁছে দেওয়া এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল।

সংক্রমণশীল ব্যাধি, ভিড়ের কারণে আরও বেশি সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা এবং ঘরমুখী বয়স্ক, শিশু ও পরিবার-সহ বেরিয়ে পড়া শ্রমিকদের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না। যে ব্যবস্থা এর জন্য করা হয়েছিল তা মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। সেজন্য সুঅভ্যাস ও ধৈর্য না থাকার জন্য বহু লোককে বেশ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ওদের ছবি দেখে এবং দুঃখের কথা শুনে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। এই নিয়ে মিডিয়াতে খুব বাদানুবাদও করা হয়েছে। সরকারপক্ষ ও বিরোধীরা পরস্পরকে অভিযোগ ও দোষারোপ করেছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই সরকারি

ব্যবস্থা সামাজিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিহারের ১০ লক্ষ ,উত্তরপ্রদেশের ৩০ লক্ষ , মধ্যপ্রদেশের ১০ লক্ষ এবং ঝাড়খণ্ডের ১.১৫ লক্ষ শ্রমিককে নিজ নিজ গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে--- এই সঙ্গে এটাও জানানো আবশ্যক (২০ মে পর্যন্ত)। মধ্যপ্রদেশে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে যাওয়ার জন্য মহারাষ্ট্র ও গুজরাট থেকে আসা ৪ লক্ষ পায়ে হেঁটে আসা শ্রমিককে স্বয়ংসেবকরা প্রশাসনের সাহায্যে উত্তরপ্রদেশের সীমানায় গাড়িতে করে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেখান থেকে উত্তরপ্রদেশ সরকার স্বয়ংসেবকদের সাহায্যে তাদের নিজের নিজের গ্রামে অথবা বিহারের সীমানায় যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেকের পরীক্ষা করা, খাবার ব্যবস্থা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ৫০ লক্ষ শ্রমিককে নিজেদের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেখানেও তাদের কোয়ারান্টাইন সেন্টারে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসবই মিডিয়ার বাদানুবাদের সময় দেখানো অত্যাবশ্যক ছিল।

লকডাউনের কারণে অর্থনীতির অগ্রগতিও স্তব্ধ হয়ে গেছে। আচমকা হাজির হওয়া এই বিপত্তির কারণে অনেক অকল্পনীয় সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করার পরিকল্পনা বা প্রয়াসের কিছু ত্রুটিও নজরে এসেছে। যার জন্য সাধারণ নিরীহ অসহায় লোকেদের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে সেটাই দুঃখের। এইসব ঘটনা নিয়ে সার্বজনীন জীবনে, মিডিয়ার বাকবিতণ্ডা এবং তার চর্চা হওয়া স্বাভাবিক। এটাও গণতন্ত্রেরই অংশ। তবুও কিছু লোক, নেতা, সংবাদমাধ্যম ও লেখক এইসব তর্কবিতর্ক চলাকালীন 'আমরাও এই সমাজের অঙ্গ' এই উপলব্ধি থেকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে এমনটাই মনে হচ্ছে। কোনো ঘটনাকে বাড়াবাড়ি করে দেখানো আর সব জায়গায় এমনটাই হচ্ছে এরকম প্রচার করাতে সমাজের আত্মবিশ্বাস, অসংখ্য কর্মচারী, আধিকারিক, সামাজিক সংগঠনের কার্যকর্তাদের নিষ্ঠা, তাদের পরিশ্রমের ওপর প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিতে পারে যা অনুচিত এবং একান্তভাবেই ভুল । এর জবাবদিহি করার সময় সমস্ত কিছুই ভুল করা হচ্ছে এইরকম ধারণা যাতে না হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা 'বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা' হওয়ার নিরিখে আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে।

আমি ১৯৯২ সালে যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। ওই সময় এক আমেরিকান বস্ত্রনির্মাণ সংস্থা আলাদা আলাদা রিভলভারের ছবি-সহ GUN লেখা টি-শার্ট তৈরি করেছিল যা সেদেশের কিশোরদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই প্রস্তুতকারক সংস্থাও প্রচুর মুনাফা করেছিল। কিন্তু পরে যখন অভিভাবকদের দৃষ্টিগোচরে এলো এই কারণে যে অল্পবয়স্কদের মধ্যে হিংসার প্রবণতা বেড়ে উঠেছে তখন তারা প্রথমে এই টি-শার্ট বাজার থেকে তুলে নিতে আন্দোলন শুরু করেছিল এবং অবশেষে যখন ওই প্রস্তুতকারী সংস্থার সমস্ত প্রকার নির্মিত বস্তুর ওপর সকলে বয়কট করার কথা আলোচনা চলতে থাকলো তখন সেই সংস্থা ওই টি-শার্ট বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হলো। যখন সংবাদমাধ্যম এই নির্মাতা সংস্থার কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করে 'এই টি-শার্ট সমাজের কিশোরদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার দেখা দিচ্ছিল, সেখানে আপনারা প্রথমেই কেন বাজার থেকে সরিয়ে নিলেন না?' তখন তাদের উত্তর ছিল 'Look, I am here in the business of making money and not in the business of morality.'' অর্থাৎ এই সমাজ আমার নিজের অথবা এই সমাজ আমার জন্য শুধু এক সম্পদের উৎস– এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে।

এই ভাবেই যদি কোথাও হিংসা, অত্যাচার, শোষণ, অন্যায়, প্রতারণার মতো ঘটনা ঘটে তখন তার ওপর নিষেধাজ্ঞা, বিরোধিতা ও প্রতিকার হওয়া উচিত। এর তদন্ত করে দোষীকে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করা উচিত। কিন্তু এইরকম ঘটনাগুলির সরলীকরণ করা, বিসম অনুপাতে তাকে বড়ো করে দেখিয়ে সম্পূর্ণ সমাজের ব্যবস্থাপনার উপর আঘাত আনা উচিত হচ্ছে কি? কিন্তু এসবই ঘটে চলেছে, কারণ এইসব করনেওয়ালাদের মনে সেই 'বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা'র উপলব্ধি হয় ক্ষীণ অথবা নিঃশেষ হতে দেখা যাচ্ছে। এদের জন্য এই সমাজ, এই সমাজের এক বিশেষ অংশ, এখানের দারিদ্র্য, অশিক্ষা , অপরিচ্ছন্নতা– এইরকম অ্যাজেন্ডাগুলি উপকরণের সামগ্রী রূপেই দেখতে পায়। এ হলো আত্মীয়তাবোধের অভাবের পরিণাম।

দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে কিছু লোক সমাজ নির্মাণের এই বিষয়গুলিকে অবজ্ঞা করে শুধু একতরফা চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হতে দেখা যায়। আমাদের বৈচিত্র্যের মূলে যে ঐক্যের সুর রয়েছে, যা আমাদের অধ্যাত্ম-নির্ভর জীবনশৈলীর দৃষ্টিভঙ্গি, যার বিস্মরণ হওয়ার কারণে অথবা উপেক্ষা করার জন্য আমাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বৈচিত্র্যকে বিভেদের উপকরণ রূপে প্রস্তুত করে সমাজে নতুনভাবে বিভাজন করার ষড়যন্ত্র বহু বছর ধরে চলে আসছে। এই প্রাচীনতম সমাজে কালান্তরে কিছু ত্রুটি অবশ্যই ঘটেছে। যার জন্য অনেক সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তার জন্য সেগুলির সংশোধন করার সযত্ন প্রয়াস আবশ্যক। কিন্তু তা করার সময় সমাজ নির্মাণ কার্যের হানি না হয় সে খেয়ালও রাখা উচিত। কিছু ঐতিহাসিক ভুল নীতির কারণে সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি দূর করে মমত্ববোধ সম্পন্ন একাত্ম সমাজ নির্মাণের জন্য সম্ভবপর সমস্ত রকমের উপায় অবলম্বন করার প্রয়াস করা উচিত। এবং তা করতে গিয়ে ঐক্যের সূত্র যাতে শিথিল না হয়ে পড়ে, পঙ্গু না হয়ে পড়ে সেই খেয়ালও রাখা অত্যাবশ্যক।

আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত এই সম্পূর্ণ সমাজ আমার সমাজ। আমাকেই একে গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতে আগত সমস্ত প্রকার সংকটের মোকাবিলা করার সামর্থ্য, একাত্মতার মধ্যে নিহিত, 'আমারা' ধারণার মধ্যেই রয়েছে। আমাদের সবাইকে, সবসময়, সব পরিস্থিতিতে এই 'আমরা' ধারণাকে বাড়াতে এবং দৃঢ় করে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ। ভাষান্তর: দেবযানী ঘোষ)

আত্মনির্ভর, প্রগতিসম্পন্ন ভারত নির্মাণে জিডিপির কুড়ি শতাংশ

শেখর সেনগুপ্ত

খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ অব্দে একটি অদ্ভুত মহামারীর কবলে পড়ে গিয়ে প্রাচীন গ্রিসের সমুন্নত রাষ্ট্র এথেন্স পেলোপনেসিয়ান যুদ্ধে স্পার্টার হাতে বিধ্বস্ত হয় এবং তার সমুদয় গৌরব ও আর্থিক বুনিয়াদ তছনছ হয়ে যায়। আর আজ তমাম বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র আর্থিক দিক থেকে কেবল বিপন্ন নয়, সকল সম্ভাবনাই যেন বিসর্জিত হতে চলেছে কোনো অতলান্তিক খাদে। আমাদের সৌভাগ্য, আমরা এই সময়ে এক স্থিরবদ্ধ, অবিচলিত, সুচিন্তার অধিকারী এক নিরভিমান ব্যক্তিত্বকে নেতার আসনে পেয়েছি। করোনা মহামারী যখন আমাদের সবদিক থেকেই বিপন্ন করে চলেছে, অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠেছে, অথচ বিরোধিতার নামে ইতিউতি চলছে বচনসার লীলাবিলাস, সেই দেশনেতা সঠিক পথে ও পন্থায় একটার পর একটা সিদ্ধান্ত ও প্রকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য এক রকম জান কবুল করে রেখেছেন। এমত প্রয়াসের সাম্প্রতিকতম নজির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক ঘোষিত ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আমাদের জিডিপির ১০ শতাংশ। করোনা আক্রান্ত ভারতকে প্রকৃতই আত্মনির্ভর করে তুলবে এই বিপুল বিনিয়োগ। আমরা এখানে ব্যক্তিবিশেষের মহত্ত্বের ব্যাখ্যায় না গিয়ে বিনিয়োগের বিশ্লেষণে যাবার চেষ্টা করব। কোথাও আত্মহারা হবার অবকাশ নাস্তি। কারণ করোনা আমাদের সর্বার্থেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করে রেখেছে। যাঁরা এখানেও রাজনীতির দুর্গন্ধ টেনে আনছেন, তাঁদের আমরা একরকম উপেক্ষা করতেই বাধ্য। এই বিপুল বিনিয়োগ মুখ্যত দেশের বিকাশ যাত্রাকে মসৃণ করবার ধারালো আয়ুধ। বহু বিষয়কেই এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যতটা সম্ভব বিপদকে কাটিয়ে উন্নয়নের পথকে খুঁজে নিতে হবে। জমি-জমা, শ্রমদানের স্থান, নগদপ্রাপ্তি, কৃষক, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, মধ্যবিত্ত ইত্যাদি সর্বব্যাপ্ত বিষয় ও নাগরিকদের স্বস্তি প্রদান। এই আর্থিক প্যাকেজ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি মস্ত ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এমত বিনিয়োগ ও তজ্জনিত সাফল্য তাঁদের মুখকেই শুকনো করে রাখবে, যাঁরা নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছেন না এখনও। ওই ভুরু কুঁচকে হড়বড় হড়বড় করে বাক্যনিক্ষেপ আমাদের নিকট অতি ব্যবহারে ক্রমশই ক্লিশে হয়ে উঠছে। এ কথা স্বীকার করে নিতে কী দোষ যে, এই আর্থিক প্যাকেজ দেশের সর্বস্তরের নাগরিকদের কাছে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে স্বস্তিদায়ক আবহ

পরিস্থিতি কঠিন। কিন্তু ভারতবাসী যে যুদ্ধজয়েও কত অনন্য, সংগ্রামী, পরিশ্রমী এবং সৃষ্টিশীল, এই ভয়ংকর সময়ে তার বিস্তর সবুদ পেলাম। ভবিষ্যতেও পাব। আমাদের শিরদাঁড়া ঋজু। তাই মাটি ফুঁড়েও উঠে দাঁড়াতে পারি।

তৈরি করবে? ধৈর্য ধরুন, দেশকে ভালো বাসুন, উন্নয়নের শামিল হন। জনগণকে নিশ্চয় সঙ্গে পাবেন। অন্যথায় সম্মানহানির সমূহ সম্ভাবনা।

একথা সত্যি যে, এই ২০ লক্ষ কোটি টাকার সঙ্গেই যুক্ত থাকছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ এবং বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের পূর্ব ঘোষিত ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজও। তাই এটা ঠিক জিডিপির ১০ শতাংশ নয় বলে মোদীজীকে যাঁরা খোঁচা মারার চেষ্টা করছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ক্রমে বুঝতে পারছি। গঠনমূলক প্রকল্পকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমর্থন জানাবার একটা বড়ো সুযোগ হারালেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের ভূমিকা রচনা করেছেন এই কথাগুলি বলে, 'করোনার বিষকামড় হেতু আত্মনির্ভরতার সংজ্ঞাটাই বদলে গিয়েছে। আত্মনির্ভরতায় আর এখন আত্মকেন্দ্রিকতা থাকলে চলবে না। তল্লাশি চালিয়ে দেখলাম, আত্মনির্ভরতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছে বিশ্বকল্যাণবোধও। ভারতে এই আত্মনির্ভরতা আজ পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে : (১) আর্থিক নীতি, (২) পরিকাঠামো, (৩) আধুনিক প্রযুক্তি, (৪) ডেমোগ্রাফি, (৫) চাহিদা।

পরিস্থিতি কঠিন। কিন্তু ভারতবাসী যে যুদ্ধজয়েও কত অনন্য, সংগ্রামী, পরিশ্রমী

এবং সৃষ্টিশীল, এই ভয়ংকর সময়ে তার বিস্তর সবুদ পেলাম। ভবিষ্যতেও পাব। আমাদের শিরদাঁড়া ঋজু। তাই মাটি ফুঁড়েও উঠে দাঁড়াতে পারি। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। করোনা সংকট শুরুর সময় ভারতে কোনও পিপিই কিট তৈরি হতো না। আজ সেই ভারতেই রোজ ২ লক্ষ পিপিই ও ২ লক্ষ এন-৯৫ মাস্ক তৈরি করা হচ্ছে।...'

প্রধানমন্ত্রীর সেই প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ১৩ মে ২০২০ বিকেলে জাতির গোচরে আনলেন ২০ লক্ষ কোটি টাকার একটি প্রকৃতই অসচরাচর প্যাকেজ। একাধিক পরিচিত জনের সঙ্গে দূরভাষে কথা বলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হলাম। তাঁরা সকলেই বিশ্লেষণ করেছেন। বিস্ফারিত হননি গগনচুম্বী খুশিতে। আবার নৈরাশ্যে দীর্ঘশ্বাসও ত্যাগ করেননি। প্রশংসা করেছেন সরকারের চেতনাকে। একজনও ছিদ্র খুঁজে বেড়াননি। মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বস্তির আবহ স্পষ্ট। আবার খুশির ছোঁয়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সকলের। করোনা কবলিত দেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটিরশিল্পোদ্যোগুলির জন্য সরকার তাঁর প্যাকেজে রেখেছেন ৩ লক্ষ কোটি টাকা। এখান থেকে ঋণ দেওয়া হবে এসএসএমই বা ক্ষুদ্র- মাঝারি সংস্থাগুলিকে। ঋণের সময়সীমা চার বছর। আর একটি মস্ত সুবিধা, এই ঋণ ১০০ শতাংশ গ্যারিন্টি ফ্রি। তার চেয়েও চমকপ্রদ বিষয়, এই ঋণ যাঁরা নেবেন, তাঁদের ১ বছর কোনও সুদই দিতে হবে না। ২০২০-এর অক্টোবর মাসে সূচনা হবে ঋণের শুভযাত্রা। ক্ষুদ্র শিল্পের যাঁরা মালিক তাঁরা তাঁদের ক্রেডিট লিমিটেডের আরও ২০ শতাংশ বেশি ঋণ নিতে পারবেন। বিত্তমন্ত্রী তাঁর ব্যাখ্যায় জানালেন, ইপিএফে সরকারি আর্থিক সহায়তার মেয়াদ আরও ৩ মাস বাড়িয়ে আগস্ট মাস অবধি করা হলো।

আবার যাদের বেতন ১৫ হাজার টাকার কম, তাঁদের পিএফ-এ জমা দেবার টাকা আগামী তিন মাস কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করবেন। আর যাঁদের মাস মাইনে ১৫ হাজার টাকার অধিক, তাঁদের আগামী ৩ মাস ইপিএফ জমা বেতনের ১২ শতাংশের বদলে ১০ শতাংশ করা হলো। তবে এই সুবিধাগুলি সবই বেসরকারি ক্ষেত্রে। সরকারি কর্মীদের অবস্থা থাকছে পূর্ববৎ। কর্মীদের ইত্যাকার সুবিধা প্রদানে সরকারের ব্যয় হবে ৬,৭৫০ কোটি টাকা। ফলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড়ো অংশ অধিকতর আর্থিক বলে বলীয়ান হয়ে উঠছেন। আর একটি বড়ো স্বস্তির খবর দিলেন নির্মলা সীতারামণ। তা হলো এই যে, আয়করের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়িয়ে করা হলো ৩০ নভেম্বর, ২০২০। এর ফলে দেশের আয়কর দাতাদের হাতে বাড়তি ৫০ হাজার কোটি টাকা থাকবে। সত্যিই এটা তাঁদের কাছে বিলক্ষণ খুশির খবর। ১৪ মে, ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২১ অবধি বেসরকারি সংস্থাগুলির টিডিএসে ২৫ শতাংশ ছাড় দেবার সুখবরও দিলেন অর্থমন্ত্রী। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মালিকরা সরকারের কাছে যত টাকা বকেয়া রয়েছে, তার সবটাই একলপ্তে পেয়ে যাবেন আগামী দেড় মাসের মধ্যে। ফলে বাজারে টাকার জোগানও অনেক বেড়ে যাবে। রেললাইন পাতা, রাস্তা তৈরি করা এবং অন্যান্য নির্মাণ কর্মে ঠিকাদারদের সময় ও আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। যে সকল সংস্থা এসএমএমই, তারা চলে আসবে ৫০ হাজার কোটি টাকার একটি বিশেষ প্যাকেজে। ফলে সবিশেষ উপকৃত হবে ৪৫ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ। আমার তো স্মরণে আসে না এযাবৎ কোনও কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের কোনও বাস্তব বা অতিলৌকিক ব্যবস্থা গ্রহণে পরিকল্পনাটুকুও করেছিলেন বলে। আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার কবলে পড়ে অনেক সংস্থাই নির্মাণ প্রকল্পে পিছিয়ে পড়ে প্রায়শ। এদের সাহায্য করতে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছেন যে, অতঃপর ২০০ কোটি টাকা অবধি নির্মাণ কর্মের টেন্ডার আর 'গ্লোবাল' হবে না। দেশীয় সংস্থাগুলির মধ্যেই প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। আবার এখন যে সকল কোম্পানি ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ৫ কোটি টাকা অবধি লেনদেন চালাতে সমর্থ হয়েছে, তারা নতুন অর্থনীতির বিচারে ক্ষুদ্র শিল্পের শিরোপা পাবে। আর যারা সর্বাধিক ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা অবধি লেনদেনের নজির গড়তে পারবে। তারা নবীন ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন শিল্পোদ্যোগের মান্যতা অর্জন করবে। এদেরই পাশাপাশি গৃহঋণ প্রদানকারী সংস্থা, নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ছোটো ছোটো বাণিজ্যিক ঋণ দিয়ে থাকে এরকম বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদিরা সরকারের কাছ থেকে পাবে 'লিকিউডিটি পুশ' শীর্ষক আর্থিক সহায়তা।

এর জন্য বরাদ্দ করা হলো ৩০ হাজার কোটি টাকা। ধারাবাহিক লকডাউনের ফলে যে সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদক এবং বণ্টন সংস্থাগুলি অর্থাভাবে কাহিল হয়ে পড়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাদের অবস্থা ফেরাতে ৯০ হাজার কোটি টাকার একটি প্যাকেজ রেখেছেন। সারা দেশ ব্যাপী সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, দীর্ঘ দ্বিমাসাধিক লকডাউনের অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে চাকরি খুঁইয়েছেন প্রায় ১০ কোটি উপার্জনক্ষম মানুষ। তাঁদের পুনরায় কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনবার শপথ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর ২০ লক্ষ কোটি টাকার মূল লক্ষ্যই হলো ওই মানুষগুলিকে পুনরায় 'আত্মনির্ভর' করা। ওই ১০ কোটি নর-নারীর সকলেই শ্রমিক নন, বহু কৃষকও রয়েছেন। অর্থাৎ যুগপৎ শ্রমিক ও কৃষক এবং অন্যান্য সকল উপার্জসক্ষম নাগরিকদের উজ্জীবিত করে তুলতে আমাদের সামনে এসে যাচ্ছে এক অতুলীয় কর্মযজ্ঞ।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই রকম অতিকায় প্রকল্প ও বিনিয়োগকেও ব্যঙ্গ করবার জন্য কিছু রাজনীতির চাদরে ঢাকা লোকের সন্ধান আমি-আপনি অবশ্যই পাচ্ছি। যেহেতু দেশটি গণতান্ত্রিক, তাই অমন অনন্য প্রয়াসকেও চিহ্নিত করতে চান এঁরা 'অশ্বডিম্ব' রূপে। মজা হলো, ওই শব্দটির প্রভাবকেই যেন পালটা শূন্যগর্ভ করে তুলতে হঠাৎই দুরন্ত চাঙ্গা হয়ে উঠল দেশের শেয়ারবাজার। প্যাকেজ ঘোষিত হয় মঙ্গলবার। আর বুধবার অর্থমন্ত্রী বিস্তারিত তথ্য দেবার আগেই বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ আর ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ফিরে পেল হারানো গতিবেগ ও প্রাণচাঞ্চল্য। বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই চড়চড় করে ১,২১৪.১৫ পয়েন্ট উঠে যায় শেয়ার সূচক। ফিফটি সূচকেও প্রাণ আসে ৩৪৭.৭৫ পয়েন্টের চকিত বৃদ্ধিতে। করোনা কবলিত একটি দেশে যখন শেয়ারমার্কেটের এই ধরনের উচ্চলম্ফন ঘটে, তার মর্মার্থ প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অনুধাবন করতে সক্ষম। আমি আর কী বলব!

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

কোভিড মহামারী দীর্ঘস্থায়ী হোক বা না হোক দ্বিতীয় মোদী সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলি রূপায়ণে অগ্রসরমান

প্রায় পক্ষকাল আগে মূলধারার প্রচারমাধ্যম এড়িয়ে গেছে বা নিতান্তই অনিচ্ছা সহকারে একটা ফুটনোটে হয়তো উল্লেখ করেছে যে অযোধ্যায় যুগ প্রতিক্ষিত এক দিব্য রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। ভারতের ইতিহাসে এ এক স্বর্ণময় অধ্যায়ের সূচনা।

অন্য সময় হলে এই সূচনাপর্বের মতো অনুষ্ঠান মূল মিডিয়ায় চূড়ান্ত প্রাধান্য তো পেতই , একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলেও সাড়া ফেলে দিত। মনে রাখতে হবে, অযোধ্যার তথাকথিত 'বিতর্কিত ভূমিতে' রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে বিক্ষোভ, আন্দোলন সারা ভারতের মানসভূমিকে ১৯৯০ সাল থেকেই আলোড়িত করেছে। এই আন্দোলন গোটা দেশে রাজনীতির প্রচলিত চোহারাটাই বদলে দিতে থাকে। শুরু হয় বিজেপির উত্থান। কোণঠাসা হতে থাকে কংগ্রেস। অবশ্যই রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে ও জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাজনৈতিক হিন্দু' নামে এযাবৎ অচেনা দেশের গরিষ্ঠ প্রজাতি। উত্তরকালের ইতিহাসবিদদের কাছে এই অযোধ্যা আন্দোলন নেহরু পরবর্তী ভারতের উত্থানের যুগান্তকারী সন্ধিক্ষণ হিসেবেই বিবেচিত হবে।

বর্তমানে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি দলের কাছে দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসবের সূচিতে রামমন্দির নির্মাণ শুরু হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা পটভূমি হতে পারত। হ্যাঁ, এটা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না যে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের সর্বসম্মতিক্রমে মন্দির নির্মাণের পক্ষে রায়দান একটি নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু যে সমস্যা বহুকাল ধরে সমাধান-ঊর্ধ্বে বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল বিশেষ করে এক শ্রেণীর সর্বজ্ঞ বুদ্ধিজীবী দেশবাসীকে সদা সন্ত্রস্ত করে তুলতেন এই বলে যে রামমন্দির নির্মাণ স্বীকৃত হলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়েছে মোদী সরকারের ধীর অথচ দৃঢ় রাজনৈতিক

সদিচ্ছার ফলে। এটা নিশ্চত করে বলা যায় অন্য কোনো সরকার যারা এই বিষয় ও এই জাতীয় আবেগ সম্পর্কে তেমন সহমর্মী নয়, তারা আদালতের রায় নিয়ে গড়িমসি করে এর বাস্তাবয়ন অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখত। ২০১৯ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসা থেকে দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম দশ মাসের উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে রামমন্দির বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের ক্ষেত্রে এটা প্রায়ই ধরে নেওয়া হয় যে এখানে নির্বাচিত হয়ে আসার পর প্রথম ১৮ মাসই মাত্র সেই সরকারটি যা কিছু প্রধান পরিকল্পিত কাজ তা সেরে নেওয়ার চেষ্টা করে। ধরে নেওয়া হয় ৫ বছর মেয়াদের বাকি সাড়ে তিন বছর সময়টা তাকে সমাপ্ত করা কাজগুলির জন্য রাজনৈতিক অগ্নি পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ বিরোধীদের তীব্র মোকাবিলা করতে হবে।

তবে এটাও ঠিক প্রথম মোদী সরকার তাদের প্রধান প্রধান যেমন বিমুদ্রীকরণ, জিএসটি বা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বালাকোটে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মতো প্রবল প্রতিক্রিয়া উদ্রেককারী সিদ্ধান্তগুলি সরকার পরিচালনার মধ্যম পর্বে বা তারও পরে নিয়েছিল। তবুও যে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রবল বিতর্ক ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে সেগুলি সরকারের 'হানিমুন পর্বের' মধ্যেই নিয়ে নেওয়া ভালো।

রাজীব গান্ধী ১৯৮৪ সালে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জিতে আসার পর তাঁর কার্যকালের প্রথম ১৮ মাসের মধ্যেই বহু প্রতীক্ষিত পঞ্জাব, অসম ও মিজোরামের

সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করার কাজে হাত লাগান। দলত্যাগ বিরোধী বিল প্রণয়নের কাজও তিনি এই সময়েই করেছিলেন। কিন্তু নজর করলে দেখা যাবে এর পরবর্তী সময়ে তাঁর কাজের খতিয়ান নিছক ভুল সিদ্ধান্ত, সুযোগ হারানো ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক চরম বিতর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভরা।

এই দ্বিতীয় মোদী সরকার তার প্রথম ১০ মাসেই যে তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা এক কথায় যুগান্তকারী। বিশেষ করে এই সিদ্ধান্তগুলি বিজেপি দলের মূল ভাব ও ভাবনার পরিপূরক। ভারত সম্পর্কে এযাবৎ টিকে থাকা ধারণা বা কল্পনা যা বলবৎ রয়েছে এগুলি তার বিকল্প হিসেবেই বরাবর লালিত হয়ে এসেছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় সেগুলি বিতর্কিত ও এতকাল যে বিষয়গুলিকে বরাবরের জন্য স্বীকৃতি ও মান্যতা দিয়ে দেশ চলছিল তার বিপরীত। এক কথায় যেগুলি ছিল অলঙ্ঘ্য, বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেগুলির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। সেই জন্য পর পর দু'বার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নির্বাচনী জয় পাওয়ার পর প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের এই সাফল্যকে নরেন্দ্র মোদী নিশ্চয় বলতে পারেন যে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি শুধু পাতা ভরানোর জন্য সুন্দর সুন্দর বাক্যবিন্যাস নয়, তার কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগে সরকারের দায়বদ্ধতা আছে।

প্রথম সিদ্ধান্তটি ছিল বহু প্রতীক্ষিত জম্মু ও কাশ্মীরে ধারা ৩৭০ ও ৩৫-এ'র বিলোপ। দেশব্যাপী এই নিয়ে সরকারকে অভিনন্দিত করা হয়। দেশের মোট ৫৪৩টি সংসদীয় ক্ষেত্রের মধ্যে মাত্র তিনটি এই সিদ্ধান্তে বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, মুসলমান মহিলাদের অবমাননাকর ও দুর্দশার মুখে ঠেলে দেওয়ার বরাবরের প্রচলিত 'তিন তালাক' রীতি বেআইনি ঘোষণা করে সাজার ব্যবস্থা করা। মুসলমান সমাজে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে লিঙ্গবৈষম্য বিলুপ্ত করতে এই আইন ছিল অত্যন্ত সময়োপযোগী। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বলবৎ থাকা ব্যক্তিগত আইনগুলি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই সমসাময়িক সময়ের পক্ষে যা মঙ্গলজনক বা ক্ষতিকারক তা বিচার করে নিয়মিত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা উচিত। এই আইন প্রণয়ন এই নীতিকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সর্বশেষে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। বিশেষ করে পূর্ব ভারতে দেশভাগ হওয়ার পর যে জ্বলন্ত সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছে তার একটি নীতিগত ও মানবিক সমাধানের ব্যবস্থা করা। অনেকে দীর্ঘদিন ধরে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এই দেশরই মূল অধিবাসীদের হিতে লাগু হওয়া আদ্যন্ত মানবিক এই আইনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিভেদমূলক আখ্যা দিচ্ছেন। আদতে এটি একটি নির্ণায়ক সিদ্ধান্ত যার ফলে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা শরণার্থীরা অন্যান্য ভারতীয়দের মতোই নাগরিকত্ব পাবে।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের সংযুক্ত আইনসভায় তাঁর মধ্যরাতের ঐতিহাসিক ভাষণে জওহরলাল নেহরু ইঙ্গিতবহভাবে বলেছিলেন, ' একটি দীর্ঘ পদানত, অবদমিত জাতির আত্মাকে মূর্ত রূপ দেবার সময় এসেছে।' আজ ভাবতে অবাক লাগে ভারতে ইতিপূর্বে এত কম সময়ের মধ্যে একটি সম্মিলিত নাগরিকত্ব (composite citizenship) প্রদানের ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিয়ে এক বৃহৎ জাতি গঠনে সম্ভাবনাকেই সফল করে তুলতে আদৌ কোনো সরকার কখনও চেষ্টা করেছিল কিনা?

দেশের মধ্যে সরকারের নাগরিকদের মঙ্গলের জন্য লাগু করা বিভিন্ন প্রকল্পগুলির দ্রুত সফল রূপায়ণের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করে নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে তাদের স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে তুলতে তাঁর সরকার সদা সচেষ্ট। অনুমান অনুযায়ী সরকারের এই লক্ষ্যের সঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে আধা বিচ্ছিন্ন রেখে কিছুটা এলোমেলো ভাবে চলতে দেওয়া মতাবলম্বীদের সঙ্গে বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবীই ছিল। আজকের তারিখে দ্বিতীয় মোদী সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক কোন পথে চলবে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে এটা নিশ্চিত বিগত ৩০ বছর ধরে ভারতীয়রা ক্রমাগত সমৃদ্ধির সোপানে ওঠার যে পথ অনুসরণ করছিল সাময়িকভাবে এই কোভিড-১৯ মহামারীর প্রকোপে তাতে কিছুটা ছেদ পড়বে। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কতদূর খাপ খাওয়াতে হবে তা সঠিক করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

আমার ধারণায় মোদী যে 'আত্মনির্ভর ভারতের' রূপরেখা দিয়েছেন তা বাস্তবে সরকারের প্রথম ১০ মাসে নেওয়া সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলির মতোই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হবে। কোভিডের আক্রমণে অবশ্যই পরিস্থিতির মোকাবিলার পন্থা বদল হবে, গাড়ির গিয়ার বদলানোর মতো কর্মপদ্ধতিতে কিছু এদিক ওদিকও হয়তো হবে, কিন্তু এটা নিশ্চত অভিষ্ট লক্ষ্যপথে কোনো পরিবর্তন হবে না।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার কলিগ্রাম শাখার প্রবীণ তথা প্রথম স্বয়ংসেবক শ্যামসুন্দর গোস্বামী (কালুদা)

গত ৮ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে কলিগ্রামে শুরু হওয়া শাখার বালক স্বয়ংসেবক ছিলেন কালুদা। সেসময় মালদা জেলা প্রচারক ছিলেন বসন্তরাও ঘার্গে। একটু বড়ো হয়ে তিনি কলিগ্রাম শাখার মুখ্যশিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন সে দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে ১ম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ করেন। অকৃতদার কালুদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।

বাংলাদেশের হিন্দুরা জন্ম থেকেই জ্বলছে

বাংলাদেশের হিন্দুরা জন্ম থেকেই জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে অঙ্গার হয়ে গেছে। সম্ভবত তাই সময় এসেছে উঠে দাঁড়াবার। বেঁচে থাকার সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে রুখে দাঁড়াবার।

শিতাংশু গুহ

মানুষের বাড়িঘর জোর করে দখল করার ঘটনা পৃথিবীর খুব বেশি দেশে সচরাচর ঘটে না। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান এটি একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এর শিকার এই দুই দেশের হিন্দুরা। পাকিস্তানকে আমরা বর্বর, সন্ত্রাসী দশ বলে আখ্যায়িত করি। আর বাংলাদেশ 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি'র চারণভূমি বলতে বলতে আমাদের মুখে ফেনা উঠে যাচ্ছে! কী চমৎকার সম্প্রীতি! প্রতিদিন হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে, কন্যা হারাচ্ছে, গৃহবধূ লাঞ্ছিতা হচ্ছেন, জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত, চাঁদা আদায়, লুটপাট, মূর্তিভাঙা, মন্দিরে আক্রমণ হরদম চলছে তো চলছেই, থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেশ এখন করোনা মহামারীর জন্যে লকডাউন। রমজান গেল। ইদ গেল। তাতে কী? হিন্দুর ওপর অত্যাচার বন্ধের জন্যে এসব যথেষ্ট নয়।

১৯৪৬ সালে কলকাতার পর নোয়াখালীতে হিন্দু নরসংহার, দেশভাগ, সেই শুরু। ১৯৪৭-এ অধুনা বাংলাদেশ বা আগেকার পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুর ওপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল, ২০২০ সালে তা অব্যাহত রয়েছে। শুধু স্থান-কাল- পাত্র ও অত্যাচারের ধরন পালটেছে। রাষ্ট্রযন্ত্র এই প্রক্রিয়ায় সহায়ক শক্তি ছিল, এখনো আছে, কখনো-সখনো সেটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, অথবা নীরব দর্শক। পাকিস্তান ১৯৫০ সালে 'জমিদারি প্রথা' বাতিল করে। মানুষ এটি স্বাগত জানায়। এই আইন শুধু পূর্ব-পাকিস্তানে কার্যকর হলো, কারণ জমিদাররা প্রায় সবাই হিন্দু। জমিদাররা কলকাতা চলে গেলেন। মুসলমানরা হিন্দুর সম্পত্তি লুটপাট করলেন। জমি দখল সেই শুরু? এই আইনের প্রচারিত মহৎ লক্ষ্য ছিল গরিব কৃষককে জমি দেওয়া। সেটা হয়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বিতাড়ন, তা সফল।

একই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সরকার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকালে (১৯৬৫) 'শত্রু সম্পত্তি' আইনটি প্রণয়ন করে। ভারত একই আইন করেছিল, যুদ্ধের সময় শত্রু দেশের নাগরিকের সম্পত্তি শত্রুদেশ যাতে উপকৃত হতে না পারে, এজন্যে এ আইনটি করা হয়। ভারতে যথাসময়ে আইনটির অবলুপ্তি ঘটে এবং এর কোনো অপপ্রয়োগ ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানে এরপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। একটি নতুন দেশের জন্ম হয়েছে। 'শত্রু সম্পত্তি' আইন ভোল পালটে 'অর্পিত সম্পত্তি' হয়েছে। রাজা এসেছেন, রাজা গেছেন, এই আইনের বহুবিধ অপপ্রয়োগ হয়েছে। মধ্যখান থেকে সরকার হিন্দুদের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ একর সম্পত্তি জোর করে নিয়ে মুসলমানদের দিয়েছে। হিসাবটি অধ্যাপক আবুল বারাকাত ও মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের। ২০১৩-তে আইনটি

বাতিল হয়েছে। কোনো হিন্দু তাঁর সম্পত্তি ফেরত বা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন বলে কেউ শোনেনি।

হিন্দুর অপরাধ সে ভারত চলে যায়। লোকে বলে, স্বেচ্ছায় যায়। আরও বলে, মুসলমানরা তো ভারত থেকে আসেনি? এই লোকগুলো জেগে ঘুমায়! বুঝে কিন্তু বলে না যে, ভারতের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী মুসলমানদের পাশে আছেন, কথা বলেন। ভারত সরকার সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখে। বিচারব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে হিন্দুদের পক্ষে কেউ নেই। দু'চারজন থাকলেও তাঁদের কণ্ঠস্বর ভয়ে নীচু। সারকারি আমলারা হিন্দু বিরোধী। বিচার নাই। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ওয়াজে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যত কথাবার্তা হয়, বিশ্বের কোথাও এমন নজির নেই। ২০০১-এর পর হিন্দুদের ওপর যত ভয়াবহ অত্যাচার হয়েছে, তার বিচার হয়নি। গত পঞ্চাশ বছরে জেহাদিরা হাজার হাজার মূর্তি ভেঙেছে, আজ পর্যন্ত একজনের বিচার হয়নি। বাংলাদেশে আক্রান্ত হয়নি এমন মন্দির খুঁজে পাওয়া যাবে না। হিন্দুর মেয়ে গণিমতের মাল। বিনোদন জগতে প্রায় প্রতিটি হিন্দু মেয়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়। স্বাবাবতই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অর্থহীন হয়ে গেছে।

একজন শায়লা খান বন্যা লিখেছেন, বাংলাদেশে এখন নব্বই শতাংশ মানুষ মৌলবাদের চর্চা করে। দিনে দিনে দেশটা মৌলবাদের আখড়া হয়ে উঠছে। যাঁরা প্রতিবাদ করছে, তাঁরা হারিয়ে যাচ্ছে বা জেলে পচছে। সদিচ্ছা থাকলে এই সরকার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারতো। তিনি বলছেন, হেফাজতিদের কথায় শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামিকরণ হয়েছে, ভাস্কর্য সরানো হয়েছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, বাউলদের জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে, মুক্তচিন্তার মানুষদের মেরে ফেলা হচ্ছে, হত্যাকাণ্ডের বিচার হচ্ছে না। শেখ হাসিনা নিজে বলেছেন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না। কিন্তু সেই অনুভূতি শুধু ইসলাম ধর্মের জন্যে প্রযোজ্য। ওয়াজ মাহফিল মোল্লারা হিন্দুধর্ম নিয়ে যাচ্ছেতাই বলে যাচ্ছে। এর জন্য কেউ জেলে যাচ্ছে না। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ধর্মভিত্তিক মানবতা দেখায়, তাই বিদ্যানন্দের কিশোর কুমার দাসের বিরুদ্ধে মামলা হয়। তিনি বলেন, সবাই মিলে যে দেশটা স্বাধীন করলো, সেই দেশটা কী হিন্দুরা এখন নিজের দেশ বলে দাবি করতে পারছে, না ভাবতে পারছে? নিজ দেশে পরবাসী থাকার যন্ত্রণা শুধু ভুক্তভোগী জানে!

ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি না, তাকে সালাম। তাঁর মতো মানুষ এখন বাংলাদেশে নাই বা থাকতে পারেন না। তিনি এসব কথা লিখতে পারছেন কারণ তিনি বিদেশে থাকেন। আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের জন্যে বিএনপি-জামাতকে দায়ী করে নিজেদের হাত পরিষ্কার রাখতে সচেষ্ট। ঘটনা হচ্ছে, হিন্দু নির্যাতনের জন্যে দেশের বড়ো বড়ো সব দল দায়ী। সবার হাত হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনেছেন মেজর জিয়া, এরশাদ। খালেদা জিয়া তা লালন করেছেন, আওয়ামি লিগ তাতে জল ঢেলেছে। চারাগাছ তাই এখন মহীরুহ। হিন্দু বা সংখ্যালঘু মুক্তমনা বা বাউলরা এর খেসারত দিচ্ছেন। দিনে দিনে বাংলাদেশে হয়তো আর একটি একাত্তর অনিবার্য হয়ে উঠছে। একাত্তরে হিন্দুরা বংলোদেশকে বিশ্বাস করেছিল, বিশ্বাসের মর্যাদা কেউ রাখেননি। সামনে হিন্দুরা কী আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে?

হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কেউ প্রতিবাদ করে না। বরং বলে, হিন্দুরা ভারতকে ভালোবাসে, তাই দেশত্যাগ করছে। ভারত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভালো না বেসে কি উপায় আছে? গণতন্ত্র আপনারও পছন্দ, তাই আপনি আপনার পুত্র-কন্যাকে ইউরোপ-আমেরিকায় পাঠান, কোনো মুসলমান দেশে নয়। ভারত আপনার অপছন্দ, কারণ ওখানে হিন্দুরা বসবাস করেন! কেউ স্বীকার করুন বা না করুন, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা দেশত্যাগ করছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অত্যাচারে। মুখে যতই শান্তির বুলি আওড়ান না কেন, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালেই 'শান্তির মা' মারা গেছে। বাস্তব হচ্ছে, বাংলাদেশের হিন্দুরা জন্ম থেকেই জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে অঙ্গার হয়ে গেছে। সম্ভবত তাই সময় এসেছে উঠে দাঁড়াবার। বেঁচে থাকার সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে রুখে দাঁড়াবার।

অথ পাশবালিশ কথা

বিশ্বপ্রিয় দাস

এতদিন অনেক তত্ত্ব বা তথ্য আমরা শুনেছি। কিন্তু পাশবালিশ তত্ত্ব এই প্রথম। এর আবিষ্কারকের নাম আর নাই বা বলা গেল। তিনি জ্ঞান বা বিজ্ঞানের নানা সূত্রের জন্মদাত্রী। কখনও তিনি ভূগোলের বিষয় বলতে গিয়ে সারা বিশ্বের দেশের সংখ্যায় নতুন তত্ত্ব বলেন। সার থেকে চাষের ক্ষেত্র সবেতেই তাঁর জ্ঞানের অবাধ বিচরণ। চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে কারিগরি বিদ্যা, অর্থশাস্ত্র থেকে সমাজতত্ত্ব সব তাঁর নখদর্পনে। ভারতের স্বাধীনতার পর এহেন এক জ্ঞানী মানুষকে এযাবৎ পায়নি আমাদের বঙ্গভূমি। নেটিজেনরা বলছেন, এই দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতসম জ্ঞানী মহীয়সীকে কোন স্থানে রাখবেন ঠিক করতে পারছেন না তাঁরা। যাই হোক, তিনি করোনার বিষয়ে বলতে গিয়ে পাশবালিশের এক নতুন তত্ত্ব গিয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। আপামর মানুষের কাছে পাশবালিশ বা কোল বালিশ নানা কারণে প্রিয়, এমনকী সারা জীবন একে আকড়ে থাকতেও ভালোবাসেন আরামপ্রিয় মানুষেরা। তাই তাঁর কথায় সমস্ত আরামপ্রিয় মানুষকে অতি ভালোবাসার সঙ্গে এই করোনাকে পাশবালিশ বানিয়ে রাখতে হবে, এটাই তাঁর সাম্প্রতিক গবেষণা।

ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যে লকডাউন নামক বিষয়টা চলে গেছে ঠাণ্ডা ঘরে। লকডাউনের প্রথম দিন থেকেই সামাজিক দূরত্বের নানা তত্ত্বের কথা মুখে বলেও তিনি একদল মানুষকে (তাঁর আমলা, দেহরক্ষী, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ও সর্বোপরি তাঁর ভাই-বোনদের দল) নিয়ে বাজারে, রেশন দোকানে লকডাউন কীভাবে মানতে হবে সেটা চকের দাগ স্বয়ং কেটে দেখিয়ে দিয়েছেন। সেটা

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত। করোনা নিয়ে তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, ওসব কেন্দ্রীয় সরকারের গুজব ও চক্রান্ত তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে থামিয়ে দেবার জন্য; মানুষের মনে ভয় ধরিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্য বলছেন। এরপর যখন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে করোনা নিয়ে মাঠে নামলেন, তখন অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। মাননীয়াকে একটা প্রশ্ন, আপনি তখন রাজনীতির কেন্দ্র বিরোধী তত্ত্ব সামনে এনে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এখন পরিস্থিতি সামাল দিতে ল্যাজে গোবরে হয়ে, প্রতিটি মানুষকে করোনার ছোবলের মুখে ঠেলে দিয়ে আপনি কী ভূমিকা পালন করছেন আপনার রাজ্যবাসীর কাছে? আপনি যখন মাঠে নামলেন, তথ্য লুকোলেন, কত ধরনের গালভরা কমিটি গড়লেন, সেই কমিটিগুলো এখন কোথায়? এর উত্তর চাওয়া যেতেই পারে। আপনার কথাতেই ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের ঘরে ফেরাবার একটা ব্যবস্থা করা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। সেই শ্রমিকরা যখন ঘরে ফিরতে শুরু করলেন, তখন আপনার ভূমিকা কী, সেটা তারা বুঝতেই পারছেন।

একেবারে শুরুর সময়ের কথায় যাওয়া যাক। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা একেবারে লকডাউন মানল না (আজও অবশ্য মানে না), তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, তাদের জন্য সব কিছু দেখে চোখ বুজিয়ে থাকা কেন? কোন সমীকরণে বিশেষ ছাড়? এর উত্তর পাওয়া যাবে না।

মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব করেন। সেটা যে মুখভরা কথা, সেটা প্রমাণ হয়েই গেছে। ফলে সেই কারণে এখন পশ্চিমবঙ্গের গর্বকে পাশবালিশের তত্ত্ব পেশ করতে হচ্ছে। সেটা প্রমাণ হয়েই গেছে। ফলে সেই কারণ হিসেবে দোষ চাপাতে হচ্ছে সেইসব মানুষদের ওপর, যারা এই রাজ্যে কাজের সুযোগ না পেয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে, বিপদে পড়ে সামান্য বাঁচার জন্য এই রাজ্যে নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছেন।

যাক, আমাদের রাজ্যে করোনা সংক্রমণ ঊর্ধ্বগতি সম্পন্ন হলেও মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে লকডাউন এই মুহূর্তে শুধুমাত্র কয়েকটি অক্ষরমাত্র হয়ে গেল। তিনি নিদান দিয়েই দিলেন, নিজের শারীরিক ক্ষমতায় নিজেকে করোনা থেকে রক্ষা করুন। ওই তত্ত্ব, পাশবালিশের তত্ত্বকে জপ করে। ■

চিঠিপত্র

করোনার শিক্ষা

আমাদের দেশে দু' মাস ধরে লকডাউন চলছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলি করোনার আতঙ্কে ধুঁকছে কিন্তু করোনা যাওয়ার নাম নেই। উলটে করোনা বেড়েই চলছে। আমাদের দেশেও আমরা বেস লাইনের ধারে কাছে পৌঁছতে পারিনি, উলটে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তার মানে কি লকডাউন ব্যর্থ? উত্তর, মোটেই না।

ভারতের বর্তমানে কোনো জীবিত ব্যক্তি লকডাউন আগে দেখেছেন কিনা সন্দেহ আছে। এটি সবারই প্রথম অভিজ্ঞতা। তাই লকডাউন মানতে মানুষ কিছু ভুল করলেও প্রথম অভিজ্ঞতার নিরিখে মানুষের ভূমিকা সদর্থক। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আটকে মানুষের চলাচল শুরু হয়েছে যার ফলে করোনা সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু মাঝের এই দু'মাস দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। লকডাউন শুরুর আগে এই চলাচল শুরু হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেত। আজ দেশের জেলা স্তরেও করোনা সামাল দেওয়ার মতো পরিকাঠামো আছে।

তবে এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিল। এখন যতদিন না করোনার কোনো ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে, ততদিন আমাদের করোনাকে নিয়েই চলতে হবে। আমার জেলা বা আমার শহর করোনা মুক্ত থাকবে এই আশা করাই বৃথা। আর করোনা আক্রান্তের সন্ধান আমার শহরে পাওয়া গেলে আতঙ্কিত না হয়েই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। সবার আগে দরকার দুটো বিষয়। প্রথমত, যতদূর পারা যায় করোনার ছড়িয়ে পড়া আটকানো আর ব্লক স্তর পর্যন্ত করোনার চিকিৎসা নিয়ে যাওয়া যাতে করোনাতে মৃত্যুর হার কমানো যায়। করোনাতে মৃত্যুর হার যদি দশমিকের অনেক নীচে নামানো যায় তাহলে করোনাও আর পাঁচটা রোগের মতোই সাধারণ একটি রোগের মতো হবে। তারপর ব্লকস্তর থেকে প্রয়োজনে গ্রাম পর্যন্ত করোনা চিকিৎসা সারা দেশেই নিয়ে যেতে হবে। একটি রাজ্য হলো অন্যটি হলো না তাই বললে কিন্তু পুরো পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

এই কথাগুলো শুনতে খুব ভারী মনে হলেও এগুলি করতেই হবে। এত দিনে কী হয়নি সেই পর্যালোচনা না করে কী হতে পারে সেই নিয়েই ভাবতে হবে। দীর্ঘদিন লকডাউন করোনা সংক্রমণ বেস লাইনের কাছে কতটা আনতে পারবে তাতে সংশয় আছে। তবে এই লকডাউনে আমরা নিজেদের অনেক গুছিয়ে নিয়েছি। এই গুছিয়ে নেওয়ার জন্যই লকডাউন। আজ জনগণের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য করোনা বাড়লে সেই ভয় নেই যেটা দু'মাস আগে ছিল। একটি কথাবলাই যায়, করোনাই আমাদের শিখিয়ে দেবে কী করে তাকে নিয়ে চলতে হবে।

—রাহুল চক্রবর্তী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

কলকাতা নর সংহারের গুরু-শিষ্য

কিছুদিন আগে বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হলো। পশ্চিমবঙ্গেও তার স্মৃতিচারণ হলো। কিন্তু এই মুজিবুর রহমানের বংশ পরিচয় জানা প্রয়োজন। এঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের। কোনো কারণে এরা ইসলাম কবুল করেন। মুজিবুর রহমানের পরিবার হিন্দুদের জাতশত্রু মনে করে। ওই অঞ্চলে নমঃশূদ্রদের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাদ বাঁধলে মুজিবের পরিবার মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত হতো। এই আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে মুজিব চরম হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালে স্থানীয় স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সে সময় মুসলিম লিগের সংগঠন করার জন্য গোপালগঞ্জে গিয়েছিলেন সৈয়দ সুরাবর্দি। সেখানকার ছাত্রবাসের দুরবস্থার কথা বলতে গিয়ে সুরাবর্দির সঙ্গে মুজিবের ওস্তাদ-সাঙ্গাত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে মুজিব ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। তার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বেকার হোস্টেলের ২৪ নং ঘরে। কলকাতায় তখন মুসলিম লিগের আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ওস্তাদ সুরাবর্দির মদতে মুজিব তখন প্রথম শ্রেণীর নেতৃত্বে উন্নীত হলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের পর ইংরেজ যখন ভারত ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন মুসলিম লিগ ভারত ভাগ করে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের দাবিতে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ সালে সমগ্র ভারতে ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিল। কলকাতায় শুরু গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস। নিকটবর্তী জেলাগুলিতে গিয়ে মুলসলমানদের উৎসাহিত করা হতে লাগল কলকাতায় গিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ নারী ধর্ষণ প্রভৃতি করার জন্য। বোঝানো হলো প্রদেশে মুসলিম লিগ সরকার আছে কারও কোনও সাজা হবে না। সেইমতো মুসলমানরা আশেপাশে গ্রামগুলি থেকে অস্ত্রশস্ত্র-সহ কলকাতায় এসে মসজিদগুলিতে ডেরা গাড়তে থাকে। খাজা নাজিমুদ্দিন মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের সভায় কোরানের নির্দেশানুযায়ী সক্রিয় হতে আহ্বান জানালেন। এ সবকিছুর দায়িত্ব মুজিবুর রহমানের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। ১৬ আগস্ট সকাল হতে না হতেই মুসলমান গুন্ডারা সুরাবর্দির সাকরেদ মুজিবের নেতৃত্বে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করল। প্রথম ৩ দিনেই ১৬ হাজার হিন্দু নিহত হলো। অসংখ্য হিন্দু নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হলো, হিন্দুর বাড়িঘর লুঠ ও অগ্নিদগ্ধ হলো। এই সমস্ত দাঙ্গাবাজদের সুষ্ঠু পরিচালনার ভার ছিল মুজিবের ওপর। ওই সময়ে কলকাতা পুলিশের ডিসিএইচকিউ ছিলেন সামসোদ্দোহা। প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দু পুলিশ অফিসারদের স্মৃতিচারণে জানা যায়, সামসোদ্দোহা লালবাজারে মুজিবের কাঁধে হাত রেখে ওয়ারলেসে জিপ গাড়ির চালকদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মুজিবকে নিয়ে কোথায় যেতে হবে এবং কী করতে হবে। অর্থাৎ চিৎপুরে গিয়ে সেখান থেকে ছোরা, রামদা, তলোয়ার ইত্যাদি কিনে বেকার হোস্টেলে পৌঁছে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পুলিশের ডিজি গোলকবিহারী

মজুমদারের স্মৃতিচারণে জনো যায়, সুরাবর্দি নিজে বুইক গাড়ি করে মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে নারকেলডাঙ্গার মুসলমান বস্তিতে অস্ত্র বিতরণ করেছিলেন। মুজিবের এক অত্যন্ত বিশ্বস্ত অনুচর লিখেছেন, 'শোনা যায় কলকাতার মহনিধন দাঙ্গায় মুজিব নিজ হাতে ছোরা নিয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন, দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।' মুজিব ব্যক্তিগতভাবে সুরাবর্দির ভাবশিষ্য ছিলেন। কাজেই গুরু যে দাঙ্গা আরম্ভ করেছিলেন তাতে সাকরেদ যে যোগ দেবেন এ আর আশ্চর্যের কী!

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,**
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

-

চীনকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে

স্বস্তিকা পত্রিকায় 'চীনের জীবাণু-যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া মাত্র' সুজিত রায় মহাশয়ের অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত প্রতিবেদন এবং আরও চারটি চৈনিক করোনা ভাইরাস বিষয়ক প্রতিবেদন পড়ে খুবই উদ্বিগ্ন হলাম। সে প্রসঙ্গেই এই পত্রের অবতারণা। কয়েক সপ্তাহ আগে একটি ভিডিয়োতে নস্ট্রাডামাসের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে উল্লেখ পেলাম 'চীন-পাকিস্তান একযোগে ভারতের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে'। অপর একটি ভিডিয়োতে জয়গুরু পন্থ সন্ত তুলসী দাস তাঁর পুস্তক 'জয়গুরুদেব কী অমরবাণী, ভাগ-২ এর ২২ পৃষ্ঠায় লেখেন : 'চীন ভবিষ্যতে আমেরিকা ও ভারতের উপর বিমানযোগে জীবাণু-বোমা ফেলে আক্রমণ করবে। তাতে অসংখ্য মানুষ মারা পড়বে।'

সেই বাণীর সত্যতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে। এবং সেই সম্ভাবনা আরও প্রকট হবার পরিবেশ তৈরি হবে ক্রমশ। কারণ চীনের ক্রোধ বাড়বে যদি করোনা-পরবর্তী সময়ে বিদেশি কোম্পানি ভারতে আসে অথবা ভারত চীনের সঙ্গে সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে। সাম্প্রতিককালের চীনের উহান গবেষণাগার থেকে কোভিড-১৯ ভাইরাস লিক হয়ে ছড়িয়ে বিশ্বকে অভূতপূর্ব সর্বনাশের কেদ্রে দাঁড় করিয়েছে চীন। উল্লেখ্য, ভারতকে দমিয়ে রাখতে ও এড়িয়ে চলতে গিয়ে বিশ্বের মহাশক্তিধরেরা আজ নিজেদেরই চরমতম সর্বনাশের সম্মুখীন হয়েছে। এখন এই ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতিতে ৮৫টি দেশ একযোগে চীনকে দায়ী করছে। স্বস্তিকার প্রতিবেদনে সেসব ক্ষতিপূরণের জন্য চীনকে চাপ দেবার কথাও বলা হয়েছে। আমি মনে করি , ওতে কোনো লাভ হবে না। কারণ বিশ্বের অকল্পনীয় ক্ষতিপূরণ চীনকে বেচলেও কুলোবে না। আর চীনের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসম্ভব, অবাস্তব। চীন সদ্ভাব রেখে পূর্ব-স্থিতি ফিরে পেতে কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হবে নিশ্চয়ই। অর্থাৎ ঘুষ দিয়ে সবাইকে চুপ করাবে। কিন্তু তার পরিণতি হবে আরও ভয়াবহ; বিশ্বকে তার চরম মাশুল দিতে হবে আগামীতে। একথা যদি বিশ্ব নেতৃত্বের বিচারে ঠাঁই পায় তাহলে তাঁরা নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন— চীনকে আর্থিকভাবে চাপে রাখা জরুরি। আরও জরুরি কূটনৈতিকভাবে একঘরে করে দেওয়া যার প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা। তারপর ডব্লিউটিও থেকে বহিষ্কার করা। চীন-স্থিত বৈদেশিক কোম্পানি অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়া। চীনা পণ্য দেশে ঢুকতে না দেওয়া। চীনা গবেষকদের গবেষণায় সুযোগ থেকে দূরে রাখা। আগে থেকে যুক্ত চীনা গবেষকদের জন্য বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা এবং গবেষণা থেকে বিরত থাকা। আর এভাবে চীনতে কোনঠাসা না করলে চরমতম সর্বনাশ হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে মানবসভ্যতার।

—**টিমিড পেনস্পিকার,**
বর্ধমান

মূল্যবান মন্তব্য!

গত ১৮ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দুটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। এক, 'সীমান্ত দিয়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে।' আচ্ছা বলুনতো এই ভাইরাস কী গোলাবারুদ বা নিষিদ্ধ নেশার দ্রব্য কিংবা গোরু-মোষ বা নোট পাচারের বিষয় যেটা বর্ডারে ঘটার সম্ভাবনা থাকে! এটা মনুষ্যবাহিত ভাইরাস, আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ মানুষের সংস্পর্শে এলে সংক্রমণ ঘটে। তাই কোনো দেশের সরকার বা উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ও সেনা বা সদস্যদের এই মারণ রোগে ইচ্ছাকৃত আক্রান্ত করে অন্যদেশে সংক্রমণ ঘটাবে না। কারণ তাহলে নিজেরাই আগে শেষ হবে। জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে, কিন্তু নিজে আক্রান্ত হয়ে শত্রুর ক্ষতি করার মতো নির্বুদ্ধিতা করে না, এমনকী পাকিস্তানও এই অপকর্ম করবে না। বাংলাদেশের তো প্রশ্নই ওঠে না, তবে তিনি অনুপ্রবেশ নিয়ে আশঙ্কা করছেন। এটা অবশ্যই চরম সত্য। বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশ সবসময় হয়। সেটাই অন্যভাবে স্বীকার করলেন।

দুই, 'ব্যাঙ্কে খুব ভিড় হচ্ছে।' ব্যাঙ্ক এত লোককে এক সঙ্গে ডাকে (এসএমএস) কেন? অনলাইনের দৌলতে অ্যাকাউন্টে কোনো লেনদেন হলে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকায় অটোমেটিক এসএমএস আসে। এজন্য ব্যাঙ্ককে আলাদা করে গ্রাহককে জানাতে (এসএমএস) হয় না। এটা অতি সাধারণ ব্যক্তিও জানে। অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাদের সামলানোর দায় রাজ্য প্রশাসনের। কারণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাঙ্কের কাজ নয়। বাজার-হাট, রেশন ব্যবস্থা, ত্রাণ বিতরণে শাসকদলের ছোটো বড়ো নেতাদের উপস্থিতি এসব কী বন্ধ আছে? পুলিশ প্রসাসন এসব সামলাচ্ছে, তাহলে ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সম্ভব নয় কেন? তবে বিরোধী নেতাদের বাইরে বেরোতে না দিয়ে আপনার পুলিশ সঠিক কাজ করেছে। কারণ রাজ্যে তৃণমূল ছাড়া বাকি দলের নেতাকর্মীরা সকলেই এই ভাইরাস ছড়ানোর চক্রান্তে হয়তো লিপ্ত। তাঁর বক্রোক্তি, 'দিচ্ছে তো মাত্র ৫০০ টাকা প্রচার করছে ৫ কোটি।' এটা ঠিক, এ রাজ্যের সরকার ও শাসক দল হয়তো বহু লোককে ৫ কোটি করে দিয়েছে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক কোটি লোককে ৫০০ টাকা করে দিলে অভাব মিটবে না, তবে ২-৩ দিন তো কিছু খাবার জোগাড় হবে। ক্ষমতার মোহে আজ মমতা ব্যানার্জি এদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছেন, ভুলে গেছেন আপনিও এই অতি সাধারণ পরিবার থেকেই উঠে এসেছেন। কেন্দ্রের বিরোধিতা করতে গিয়ে নিজেই কেন্দ্রের প্রচার করে দিলেন। আসলে কাজের তুলনায় আত্মপ্রচার আপনি খুব ভালোবাসেন।

—**সঞ্জয় দত্ত,** নবাবপুর, হুগলি।।